মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৩ ঈসায়ী

রমাযান-শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী

চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৯-৩০ বাংলা

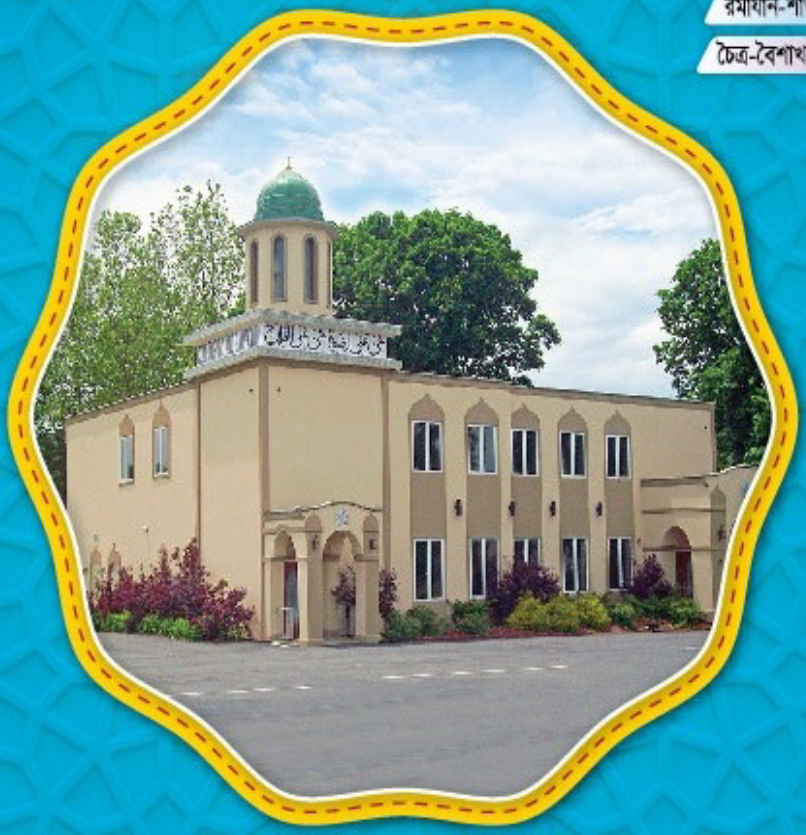

মসজিদ আল-ইখলাস, নিউইয়র্ক

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

এপ্রিল	২০২৩ ঈসায়ী
রমাযান-শাওয়াল	১৪৪৪ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ	১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন

ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd

www.ahlahadith.net.bd

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন

❖ মাহে রমাযান ও সিয়ামের বিধি-বিধান.....০৩
শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস

❖ রমাযান মাসে দান-খায়রাতের ফযীলত.....০৫
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়

❖ জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহা সম্মেলন সফল ২০২৩ ও স্বাগত মাহে রমাযান ১৪৪৪ হিঃ.....০৮

প্রবন্ধ :

❖ মুক্তিপ্রাপ্ত দল : প্রকৃতি, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য.....০৯
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

❖ দা'ওয়াতুন নববী শর্ত ও সতর্কতা ১২
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব

❖ ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প.....১৬
আব্দুল্লাহ বিন আইউব

❖ অদৃশ্য জগতের গল্প.....২০
ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ

❖ প্রেম অগ্নিদহন যন্ত্রণা.....২৩
সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা

❖ যাকাত : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা.....২৮
তাওহীদ বিন হেলাল

❖ বিদ'আত চেনার ২৩টি মূলনীতি.....৩৩
সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব

❖ যেমন ছিল সালাফদের রমাযান.....৩৮
মাযহারুল ইসলাম

❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪২

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

মাহে রমাযান ও সিয়ামের বিধি-বিধান

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী❖

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

অনুবাদ : রমাযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ বা আবরণ। তোমরা যে নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে আল্লাহ তা'আলা তা জেনেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন তা অনুসন্ধান করো। আর তোমরা আহার করো ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত অবধি তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর। আর মসজিদে ই'তেকাফ করা অবস্থায় তোমরা (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, অতএব, তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না; এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য বিবৃত করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : ইসলামের প্রথম দিকে যখন রমাযানের সিয়াম ফরয করা হয় তখন ইফতারের পর থেকে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া বৈধ ছিল। কেউ যদি এর পূর্বেই শুয়ে ঘুমিয়ে যেত তার জন্য ঐসব হারাম হয়ে যেত, ফলে সাহাবীগণ এ ব্যাপারে সমস্যা বোধ করেন। যেমন : কায়েস ইবনু সিরমাহ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সারাদিন জমিতে কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, কিছু খাবার আছে কি? স্ত্রী বলেন, কিছুই নেই। তবে আপনি অপেক্ষা করুন, আমি কোথাও হতে কিছু খাবার নিয়ে আসছি। স্ত্রী যখন কিছু খাবার নিয়ে আসলেন ততক্ষণে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে তার জন্য ঐ রাতে খানা-পিনা হারাম হয়ে যায়। ফলে তিনি কিছু না খেয়েই পরদিন সিয়াম পালন করেন এবং দুপুরের দিকে ক্ষুধার তাড়নায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে অবগত করানো হলে أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ..... مِنَ الْفَجْرِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর এতে সাহাবীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন।[২]

অনুরূপভাবে সাহাবীগণ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে তাঁদের স্ত্রীদের নিকট যেতেন না। আবার কোনো কোনো সাহাবী রাতে ঘুম ভাঙার পর স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ে মানসিক কষ্টে পড়ে যেতেন। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা-

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾

আয়াতটি নাযিল করে পূর্বের বিধান রহিত করে সূর্যাস্তের পর হতে সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে বৈধ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

❖ *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা*

[১] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭*

[২] *সহীহ বুখারী হা : ১৯১৫*

আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা রমাযানের রাতে খানা-পিনা ও স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়াকে হালাল করেছেন, যতক্ষণ না রাতের কালো আঁধার দূর হয়ে সুবহে-সাদিকের আলো পরিস্ফুটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেছেন যে, যতক্ষণ না সাদা সূতা থেকে কালো সূতা পার্থক্য করা যায়। অতঃপর তিনি مِنَ الْفَجْرِ দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসবের সময়-সীমা হলো ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'প্রত্যুষে কালো সূতা হতে সাদা সূতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো' বিধান নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক তাদের পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নেয় এবং সাদা ও কালোর মধ্যে পার্থক্য না করা পর্যন্ত তারা পানাহার করত। অতঃপর مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি নাযিল করাতে বুঝা গেল যে, কালো সূতা এবং সাদা সূতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাতের অন্ধকার আর দিনের শুভ্রতা। অর্থাৎ, সিয়াম পালনের জন্য খানা-পিনার সর্বশেষ সময় সুবহে-সাদিকের বা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। আলোচ্য আয়াতে وَكُلُوا وَاشْرَبُوا দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সাহারী খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন হাদীসেও রয়েছে :

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারী খাওয়াতে বরকত রয়েছে।[৩]

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন,

«إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»

আমাদের এবং আহলে কিতাবদের মাঝে পার্থক্যই হচ্ছে সাহারী খাওয়া।[৪] আর যেহেতু আল্লাহর নাবী ﷺ তাঁর উম্মাতকে আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করতে বলেছেন, তাই সাহারী খেতে হবে। কারণ আহলে কিতাবরা সাহারী খেত না। হাদীসে সাহারী খাওয়ার উত্তম সময়ের কথাও বলে দেয়া হয়েছে, আর তা হলো সাহারীর সময়ের শেষ সময়। অর্থাৎ সাহারী খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই যেন সুবহে-সাদিক হয়ে যায়। এ মর্মে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

«تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ» ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»

আমরা সাহারী খাওয়া মাত্রই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতাম। তখন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সাহারী খাওয়া শেষ হওয়া এবং ফজরের আযান আরম্ভ হওয়ার মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল। তিনি বলেন : ৫০ আয়াত তিলাওয়াত করার সমপরিমাণ।[৫]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»

আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি (সময় হওয়া মাত্র) ইফতার করবে।[৬] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার নিকট ঐ বান্দাগণ সবচেয়ে বেশি প্রিয় যারা (সময় হওয়া মাত্র) তাড়াতাড়ি ইফতার করে।[৭]

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ করা অবস্থায় (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবে না। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তি মতে, যে ব্যক্তি মসজিদে ই'তেকাফ করবে, তা রমাযান মাসে হোক বা অন্য কোনো সময়ে হোক, ই'তেকাফ পূর্ণ না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া হারাম। যহ্হাক, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন যে, পূর্বের লোকেরা ই'তেকাফ অবস্থায়ও স্ত্রীর সাথে মিলিত হতো, ফলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ে মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের নিকট গমন করাকে হারাম করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا - এ হলো আমার বর্ণনাকৃত কথা, ফরযকৃত নির্দেশাবলী ও নির্ধারিত সীমারেখা সিয়াম এবং এর বিধি-বিধান সম্পর্কে। সুতরাং এ সীমারেখা তোমরা লঙ্ঘন এবং অতিক্রম করো না।

[৩] সহীহ বুখারী হা : ১৯২৩, সহীহ মুসলিম হা : ১০৯৫
[৪] আবূ দাউদ হা : ২৩৪৩
[৫] তিরমিযী হা: ৭০৩
[৬] সহীহ বুখারী হা : ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম হা : ১০৯৮
[৭] তিরমিযী হা : ৭০০

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

রমাযান মাসে দান-খায়রাতের ফযীলত

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»

হাদীসের অনুবাদ : ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমাযান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা একে-অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমাতের বায়ূ অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।[৮]

রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : নাম-আব্দুল্লাহ, পিতার নাম : আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব। মায়ের নাম : লুবাবাহ বিনতুল হারিস। তিনি হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে মক্কার শিআবে আবী তালিব-এ জন্ম গ্রহণ করেন। তার উপনাম আবুল আব্বাস। উপাধি : হাবরুল উম্মাহ (উম্মাতের পণ্ডিত), তারজুমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার)। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্ব মূহূর্তে হিজরতের উদ্দেশে তাঁর পিতার সাথে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। জুহফা নামক জায়গায় নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে, বিধায় তারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর হুনায়ুন এবং তায়িফ যুদ্ধেও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সর্বদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথেই থাকতেন এবং তার নিকট থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এ বলে দু'আ করেন :

" اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ "

হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান কর এবং কুরআনের ব্যাখ্যা শিখিয়ে দাও'।[৯] উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে তিনি তাঁর পরামর্শ সভার সদস্য ছিলেন। ২৭ হিজরীতে আফ্রিকা বিজয়কালে তিনি ইবনু আবী সারহের সঙ্গী ছিলেন। ৩৫ হিজরী সালে উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশক্রমে হজ্জের আমীর নিযুক্ত হন। উষ্ট্রীর যুদ্ধে এবং সিফফীনের যুদ্ধে তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলেন। ৩৬ হিজরী সালে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বাসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। ৩৯ হিজরী সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। ফলে তিনি তায়েফে বসবাস করেন। ৬৮ হিজরীতে ৭১ বৎসর বয়সে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি যায়িদ ইবনু সাবেত এবং উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিকট থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি যে সকল সাহাবার নিকট হাদীস শুনেছেন : স্বীয় পিতা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, স্বীয় মাতা উম্মুল ফাযল, স্বীয় ভাই ফাযল ইবনু আব্বাস, স্বীয় খালা মায়মুনাহ, আবূ বকর; উমার, উসমান, আলী, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবূ যার গিফারী, উবাই ইবনু কা'ব, তামীমুদদারী, খালাত ভাই খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, উসামা ইবনু যায়দ, হামাল ইবনু মালিক, সা'ব ইবনু জাসসামাহ, আম্মার ইবনু ইয়াসির আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ তালহা, আবূ হুরায়রাহ, মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান, আবূ সুফিয়ান, আয়িশাহ, আসমা বিনতু আবী বকর, সাওদাহ বিনতু যাম'আহ, উম্মু হানী, উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রমুখ।

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[৮] *সহীহ বুখারী হা : ৬*

[৯] *মুসনাদ আহমাদ হা: ২৩৯৭*

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন :

স্বীয় দুই ছেলে আলী ও মুহাম্মাদ, নাতী মুহাম্মাদ ইবনু আলী; স্বীয় ভাই কাছীর ইবনু আব্বাস, ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইবনু উবায়দুল্লাহ, আরেক ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইবনু মা'বাদ, সাহাবাদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, সা'লাবা ইবনুল হাকাম, মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ আরো অনেকে রাযিয়াল্লাহু আনহুম

তাবেয়ীদের মধ্য থেকে : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ, আলকামাহ ইবনু ওয়াক্কাস, আলী ইবনুল হাসান, ইকরিমাহ, আতা, তাউস, কুরাইব, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, মুজাহিদ, আমর ইবনু দীনার এবং আরো অনেকে *(রাহীমাহুমুল্লাহু আজমাঈন)*

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর গণনা মতে তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয়েই তার থেকে ৭৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র বুখারী বর্ণনা করেছেন ১১০টি হাদীস। আর শুধুমাত্র মুসলিম বর্ণনা করেছেন ৪৯টি হাদীস।

হাদীসের ব্যাখ্যা : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। أَجْوَدَ শব্দটির উৎপত্তি جود থেকে যার অর্থ দয়া করা, এটি একটি প্রশংসিত গুণ। যেমন তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ

নিশ্চয় আল্লাহ দানশীল, তিনি দানশীলতাকে ভালবাসেন।[১০]

أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ রমাযান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, অর্থাৎ তিনি সর্বদাই অধিক দানশীল ছিলেন অন্যদের তুলনায়। রমাযান মাস এলে তিনি দানের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতেন। এজন্য যে, এ মাসের মর্যাদা অন্য মাসের তুলনায় বেশি। ফলে এ মাসের আমলের সাওয়াবও বেশি। কেননা এতে অভাবী সিয়াম পালনকারীদের সাহায্য করা হয়। তাইতো যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারীকে সাহায্য করে থাকে সে ব্যক্তি ঐ সিয়াম পালনকারীর সমান সাওয়াব পেয়ে থাকে। যেমনটি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ যে ব্যক্তি সিয়াম পালন কারীকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তি ঐ সিয়াম পালনকারীর সমান সাওয়াব পাবে। অথচ সিয়াম পালনকারীর সাওয়াব একটুও কম করা হবে না।[১১] মোট কথা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে অন্য মাসের তুলনায় বেশি দান করতেন। আর তিনি হলেন আমাদের তথা মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। তাই সকল মুসলিমের কর্তব্য হলো রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে রমাযান মাসে বেশি বেশি দান করা। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : বদান্যতার সবচাইতে উঁচু স্তর হলো ইলম বিতরণ করা। কেননা ইলমের মর্যাদা মালের চাইতে অনেক বেশি। ইলম বিতরণ করার অর্থ হল মানুষকে ইলম শিক্ষা দেওয়া অথবা ইলম অর্জনে সহযোগিতা করা। অনুরূপভাবে কেউ কোনো বিষয়ে মাসআলা জানতে চাইলে তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। ইলম চর্চার ব্যবস্থা করা তথা শিক্ষা কেন্দ্র যেমন মাদরাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মাঝে দ্বীনী ইলম প্রসারের ব্যবস্থা করাও বদান্যতার অন্তর্ভুক্ত। যা কখনো কৃপণের দ্বারা সম্ভব নয়।

حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ 'জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন' হাদীসের এ অংশ থেকে জানা যায় যে, সৎ কর্মশীল লোকদের সম্মানার্থে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া উচিৎ। কেননা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাতের সময়ে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। আর তিনি অর্থাৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম মালায়িকার মধ্যে সর্বোত্তম ও প্রধান ফেরেশতা।

وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ.

'আর জিবরীল আলাইহিস সালাম রমাযান মাসের প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سنة 'জিবরীল আলাইহিস সালাম

[১০] *তিরমিযী হা : ২৭৯৯*

[১১] *তিরমিযী হা : ৮০৭*

প্রতি বছরই রমাযান মাসে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। অর্থাৎ সারা বছর কুরআনের যতটুকু অবতীর্ণ করা হতো প্রতি বছর রমাযান মাসে তা পুনরায় পাঠ করতেন যাতে তা রাসূল ﷺ-এর হৃদয়ে গেঁথে যায়।

أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

'নিশ্চয় রাসূল ﷺ রহমাতের বায়ুর চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। অর্থাৎ প্রবাহিত বায়ু যেমন দ্রুত কল্যাণ নিয়ে আসে তেমনি রাসূল ﷺ-এর দানের গতি ছিল দ্রুত। তিনি দানের ক্ষেত্রে গড়িমসি করতেন না। বরং তাঁর হাতে যতক্ষণ পর্যন্ত মাল থাকতো ততক্ষণ পর্যন্ত দান করতেই থাকতেন তা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত।

যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ القَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ، فَقَالَ: «ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ - أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا - فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ»

উকবাহ ইবনুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নাবী ﷺ-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরিয়েই তিনি দ্রুত উঠে তাঁর কোনো এক সহধর্মিণীর নিকট গেলেন। অতঃপর বেরিয়ে এলেন। তাঁর দ্রুত যাওয়া আসার ফলে উপস্থিত সাহাবীগণের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পেয়ে তিনি বললেন : সালাতরত অবস্থায় আমার নিকট রাখা একটি সোনার টুকরার কথা মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় বা রাতে তা আমার নিকট থাকবে আমি তা অপছন্দ করলাম। তাই তা বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিলাম।[১২]

[১২] *সহীহ বুখারী হা : ১২২১*

হাদীসের শিক্ষা :

(১) সর্বদা দানের হাত উন্মুক্ত রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

(২) রমাযান মাসে বেশি বেশি দান করা।

(৩) কল্যাণকামী লোকদের সমাবেশের সময়ে অধিকহারে দান করা।

(৪) সৎলোকদের সাথে যিয়ারত করতে যাওয়া।

(৫) রমাযান মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা।

(৬) রমাযান মাসে একাধিকবার সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করা।

(৭) কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম যিকর।

(৮) কুরআন হিফয করার উদ্দেশ্যে অন্যকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো।

(৯) ফকীর-মিসকিনদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা।

(১০) গোনাহ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

(১১) ইলম প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রাহী? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাত"- যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা:

ফাতাওয়া বিভাগ

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।

ই-মেইল: tarjumanulhadeethbd@gmail.com

সম্পাদকীয় الافتتاحية

জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহা সম্মেলন সফল ২০২৩ ও স্বাগত মাহে রমাযান ১৪৪৪ হিঃ

আল-হামুদুলিল্লাহ। ৯ ও ১০ই মার্চ ২০২৩ স্মরণ কালের বৃহত্তম দাও'য়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আশুলিয়ার বাইপাইলে জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানা ও আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মডেল মাদরাসা ময়দানে। লক্ষাধিক মুসল্লির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত জমঈয়তে আহলে হাদীসের এ মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উচ্ছ্বাস আবেগ ছিল চোখে পড়ার মতো। সংখ্যার দিক থেকেও পূর্বের যে কোনো কনফারেন্স, মহা সম্মেলনের চেয়ে অংশগ্রহণকারী ছিল সর্বাধিক। এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুকের আমন্ত্রণে যোগদান করেছিলেন নেপাল জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সভাপতি, অল-ইন্ডিয়া জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত আমীর ও সভাপতি এবং জর্ডান ও সৌদী আরবের সম্মানিত দাঈবৃন্দ। বিদেশি মেহমানদের অংগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্মেলন হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মহা সম্মেলন। দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগানো এ মহা সম্মেলন আবারো প্রমাণ করলো বাংলাদেশে আহলে হাদীসদের একমাত্র প্রাচীন ও সর্বজনপ্রিয় দা'ওয়াতী সংগঠন একমাত্র বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সংগঠন ছেড়ে জমঈয়তে আহলে হাদীসের পতাকাতলে যোগদান করে প্রমাণ করেছেন আহলে হাদীসদের প্রাণের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। স্বার্থক, সফল মহা সম্মেলন আয়োজন করার জন্য জমঈয়ত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন। এবার মার্চ মাসেই রমাযান শুরু হল। ক্ষমার বার্তা নিয়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতিতে বছর ঘুরে আবারও মাহে রমাযান আমাদের নিকট উপস্থিত। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের জন্য আরেকটি রমাযান মাস উপহার দিলেন। মুমিন জীবনে রমাযান মাস পাওয়ার অর্থই হলো জান্নাত লাভের একটি সুযোগপ্রাপ্ত হওয়া। প্রত্যাশা পূরণ, দয়া ও করুণা লাভের মাস রমাযান। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস রমাযান। এর প্রতিটি দিন আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ। প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষমা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের। সাগরের ফেনাসম গুনাহের অধিকারীর জন্যও রমাযান মাগফিরাত লাভের মাস। ১১ মাস শয়তানের প্ররোচনায় বান্দা যখন পাপ সাগরে নিমজ্জিত, পশ্চিম গগণে তখনই দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও পরিত্রাণের জন্য উদিত করেন মাহে রমাযানের চাঁদ। ব্যবস্থা করে দেন নাজাতের। সাওমের বাংলা অর্থ বিরত থাকা, পরিহার করা, দূরে থাকা, ত্যাগ করা। সব ধরনের পাপাচার পরিহার করে, দিবাভাগে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ থেকে নিজেকে দূরে রেখে সাওমের মাধ্যমে বান্দা যা অর্জন করেন তার নাম তাক্বওয়া। তাক্বওয়া মুমিন জীবনে এক বড় অর্জন। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট পুরস্কার উচ্চমর্যাদার জান্নাত। আর মুত্তাকী হওয়ার প্রশিক্ষণ হচ্ছে রমাযানের সিয়াম সাধনা। আমরা আল্লাহর নিকট সবসময় এ কামনাই করব, তিনি যেন আমাদেরকে প্রকৃত মুমিন ও মুত্তাকী হওয়ার তাওফিক দান করেন। রমাযান মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল কুরআন নাযিল করেছেন। সেজন্য রমাযানের আরেক পরিচয়, কুরআনের মাস রমাযান। বিশ্ব মানবের হিদায়েতের জন্য তিনি এই কুরআন নাযিল করেন। কুরআন আলোকবর্তিকা, পথপ্রদর্শক, হিদায়াত ও নূর। যার হৃদয় কুরআনের আলো বঞ্চিত সে প্রকৃত অর্থেই বিরান ঘর, আলোহীন মৃত হৃদয়। এবারও রমাযান মাসে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে দেশব্যাপী কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, রাতে সালাতুত তারাবীহ আদায়, ইফতার-সাহারী ও বিভিন্ন নেকির কাজের মাধ্যমে রমাযানের প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা যেন কাজে লাগাতে পারি সেরকম একটি পরিকল্পনা প্রত্যেকের থাকা প্রয়োজন। সেই সাথে দা'ওয়াহ ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত জমঈয়তের প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা যেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হই সেজন্য মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করছি। এই রমাযানে জমঈয়তের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সচল ও সফল করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার বিষয় অগ্রধিকার দেব ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমাযানের বরকত ও মাগফিরাত নসীব করুন। আমীন।

মুক্তিপ্রাপ্ত দল : প্রকৃতি, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

(শেষ পর্ব)

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য :

হাদীসের আলোকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য হল রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যে পথের অনুসারী ছিলেন সে পথের অনুসরণ করা। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর অনুসরণের পাশাপাশি রসূলের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ أَطِيْعُواْ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ﴾

'আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুসরণ কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না'।[১৩] রাসূল ﷺ ও বিভিন্ন হাদীসে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত মতপার্থক্যের সময় রাসূলের ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة.

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব (মতভেদের সময়) আমার সুন্নাত এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মজবুতভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাক। আর সব বিদ'আত থেকে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেকটি বিদ'আতই গুমরাহী'।[১৪] এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন মতবিরোধ দেখা দিবে তখন তোমরা আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে। আর আমার সাহাবীগণ আমাকে যেভাবে অনুসরণ করছে, যেভাবে আমল করছে, যে আক্বীদা পোষণ করছে, তোমরা সেভাবেই আমার অনুসরণ করবে। সাথে সাথে ইসলামের নামে নবআবিষ্কৃত বস্তু থেকে দূরে থাকবে। আজকের দিনে এই মতবিরোধপূর্ণ সমাজে যদি আমরা রাসূল ﷺ-এর অনুসারী হতে পারি এবং সাহাবীগণ যেভাবে আল-কুরআন ও হাদীসকে বুঝেছেন ও আমল করেছেন সেভাবে বুঝতে ও আমল করতে পারি, তাহলেই আমাদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব। একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পূর্বেই ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামের মধ্যে কম-বেশি করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। বিদায় হজ্জের দিন আল্লাহ নাযিল করলেন,

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا﴾

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'।[১৫] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ক্বিয়ামতের দিন সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৬] রাসূল ﷺ প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাঁর বাস্তব জীবনই হল 'হাদীস' বা 'সুন্নাহ'। এ কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করা হবে এবং মতবিরোধপূর্ণ সময়ে সঠিক পথ পাওয়া যাবে। বিদায় হজ্জের দীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ বলেছেন,

---

* *সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সহকারী অধ্যাপক : আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।*

[১৩] *সূরা আলে ইমরান আয়াত : ৩২, এছাড়াও সূরা নিসা আয়াত : ১৩-১৪, ৫৯, ৬০-৬১, ৭৯-৮০, মায়েদা-৯২, আনফাল-২৪, ৪৬; নহল-৪৪ ও নূর-৬৩ আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে*

[১৪] *আবূ দাউদ হা : ৪৬০৭; তিরমিযী হা : ২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা : ৪২৪৪; আহমাদ হা : ১৬৬৯৪; ইবনু খুযায়মা, 'জুম'আ' অধ্যায় হা: ১৭৮৫; মিশকাত হা : ১৬৫; রিয়াযুস সালেহীন হা : ১৫৭*

[১৫] *সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ৩*

[১৬] *সূরা আলে ইমরান আয়াত : ৮৫*

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ.

'আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি তা মজবুতভাবে ধরে থাকলে আমার পরে কখনও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর সেটা হল আল্লাহর কিতাব'।[১৭] এখানে কিতাবুল্লাহ বলতে শুধু কুরআনকে ধরে রাখার কথা বলা হয়নি। হাদীসও মেনে চলতে হবে। কারণ আল-কুরআনে রাসূলের অনুসরণ করার নির্দেশ আছে। সাহাবীগণ ও সালাফে সালেহীন সত্যের পথে থাকার জন্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন এবং অন্যকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

لا ينفع قول إلا بعملٍ، ولا عمل إلا بقـولٍ، ولا قـول ولا عمل إلا بنيةٍ، ولا نية إلا بموافقة السنة.

'আমল ব্যতীত কোনো কথা উপকারে আসবে না, কোনো আমলও কথা ব্যতীত উপকারে আসবে না। কোনো কথা ও আমল নিয়্যাত ব্যতীত উপকারে আসবে না, আর কোনো নিয়্যাতও উপকারে আসবে না সুন্নাতের আনুকূল্য ব্যতীত'।[১৮] উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, عليـكم بالسبـيل والسـنة. 'তোমরা সঠিক পথ ও সুন্নাত অবধারিত করে নাও'।[১৯] প্রখ্যাত তাবেঈ যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, كان من مـضى من علمائنا بقول الاعتـصام بالسنة نجاة. 'আমাদের আলেমদের মধ্য হতে যাঁরা অতীত হয়েছেন, তাঁরা বলতেন সুন্নাতকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরা মুক্তি (রক্ষাকবচ) স্বরূপ'।[২০]

ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, السـنة سفـينة نوحٍ، من ركبـها نجا، ومن تخـلّف عنها غرق. 'সুন্নাত হল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকাসদৃশ। যে তাতে আরোহণ করবে সে পরিত্রাণ পাবে, আর যে তা থেকে পিছে অবস্থান করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে'।[২১] উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হওয়ার জন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাতের ওপর আমল করতে হবে। রাসূলকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করে কোনো ইমাম, পীর বা কোনো দলের অন্ধ অনুসরণ করে মুক্তি পাওয়া যাবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং সাহাবীদের অনুসরণের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে।

বর্তমান শতধাবিভক্ত সমাজে আমাদেরকে সঠিক দল খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে পবিত্র আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আশ্রয় নিতে হবে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে যারা হক্ব তাদেরকেই সঠিক জানতে হবে। অনেকে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে থাকেন, অথচ তাদের কাজগুলো সুন্নাতবিরোধী। সুন্নাতবিরোধী আমল করে কিভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়?

মুক্তিপ্রাপ্ত দল ও আহলুল হাদীস

'মুক্তিপাপ্ত দল কোনটি' এর পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ 'আহলুল হাদীস'দের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক বলেন, هم عندى أصحاب الحديث 'আমার নিকটে তাঁরা হল হাদীসের অনুসারী বা আহলুল হাদীস'।[২২] ইমাম বুখারীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, هم أهل الحديث 'তাঁরা হচ্ছেন আহলুল হাদীস'।[২৩] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'যদি তারা আহলুল হাদীস না হয়, তাহলে আমি জানি না তারা কারা'।[২৪] উল্লেখ্য যে, মাযহাব চতুষ্টয়ের তিন ইমামই আহলে হাদীস হিসাবে পরিচিত ছিলেন।[২৫] ইয়াযীদ ইবনে হারূন (১১৮-২১৭ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟

---

[১৭] *তিরমিযী হা : ৩৭৮৬*

[১৮] *আজুররী, কিতাবুশ শরী'আত, পৃ. ১২৩, গৃহীত : বায়হাক্বী আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজুবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-কারীমা,পৃ. ৫*

[১৯] *শরহু উসুলিল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ১/৫৬; আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজুবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-কারীমা, পৃ. ৬*

[২০] *সুনানুদ দারেমী, মুক্বাদ্দামাহ, আছার নং ৯৬, সনদ ছহীহ।*

[২১] *আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজুবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-কারীমা, পৃ. ৬*

[২২] *শায়খ মুহাম্মদ বিন জামিল, আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ, 'মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি' অনুচ্ছেদ*

[২৩] *তদেব*

[২৪] *তিরমিযী, ফাতহুল বারী, ১৩/৩০৬ হা : ৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা সহীহাহ হা : ২৭০-এর ব্যাখ্যা।*

[২৫] *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, আগস্ট ১৯৯৪), পৃঃ ৬৯-৭১*

'তাঁরা যদি আহলেহাদীস না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা'।[২৬] ইমাম বুখারীও এ বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন'। ক্বাযী আয়ায বলেন, أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَ مَنْ يَّعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ 'ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীস-এর মাযহাব অনুসরণ করে, তাদেরকে বুঝিয়েছেন'।[২৭] ইমাম আহমাদ আরো বলেন,

لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِىْ خَيْراً مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، لاَ يَعْرِفُوْنَ إِلاَّ الْحَدِيْثَ.

'আহলে হাদীসের চেয়ে উত্তম কোনো দল আমার কাছে নেই। তারা হাদীস ছাড়া অন্যকিছু চেনে না'।[২৮] ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ) একদা তাঁর দরবার সম্মুখে কতিপয় আহলে হাদীসকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, مَا عَلَى الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْكُمْ 'ভূপৃষ্ঠে আপনাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই'।[২৯] আহমাদ ইবনু সারীহ বলতেন, أَهْلُ الْحَدِيْثِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الْفُقَهَاءِ لِاِعْتِنَائِهِمْ بِضَبْطِ الْأُصُوْلِ - 'দলীলের ওপর কায়েম থাকার কারণে আহলে হাদীসগণের মর্যাদা ফক্বীহগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে।[৩০] ইমাম আবূ দাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেন, لَوْلاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِىْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ- 'আহলে হাদীস জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[৩১] ওসমান ইবনু আবী শায়বা একদা কয়েকজন আহলে হাদীসকে হয়রান অবস্থায় দেখে মন্তব্য করেন যে, إِنَّ فَاسِقَهُمْ خَيْرٌ مِنْ عَابِدِ غَيْرِهِمْ 'আহলে হাদীসের একজন ফাসিক্ব ব্যক্তি অন্য দলের একজন আবিদের চেয়েও উত্তম'।[৩২] ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

مِنَ الْمَعْلُوْمِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ بَحْثًا عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَ طَلَبًا لِّعِلْمِهَا وَ أَرْغَبِ النَّاسِ فِىْ اِتِّبَاعِهَا وَ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوًى يُخَالِفُهَا ... فَهُمْ فِىْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ كَأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِىْ أَهْلِ الْمِلَلِ.

'যার কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার এটা জানা কথা যে, আহলে হাদীসগণ হ'লেন মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীসমূহের ও তাঁর ইলমের অধিক সন্ধানী ও সেসবের অনুসরণের প্রতি অধিক আগ্রহশীল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী, যার বিরোধিতা সে করে থাকে।... মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান'।[৩৩]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কারা এ প্রশ্নের জবাবে শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালিহ আল-উসায়মীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তারাই, যারা আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকে ও তার ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ কারণেই তাদেরকে আহলে সুন্নাতরূপে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তাঁরা সুন্নাহর ধারক ও বাহক। তাদেরকে আহলে জাম'আতও বলা হয়। কারণ তাঁরা সুন্নাহর ওপর জামা'আতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ'।[৩৪]

এ কথা পরিষ্কার যে, পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্গত হওয়ার জন্য কোনো নামী-দামী দলের সদস্য হওয়া বা কোনো নামকরা ইমামের অনুসারী হওয়া শর্ত নয়; বরং যথাযথভাবে পবিত্র আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করা শর্ত। সুতরাং যে দল বা সংগঠনের কথা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের সাথে মিলে যায়, সে দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। পক্ষান্তরে কোনো ইমাম বা দলের কথার সাথে যদি রাসূলের হাদীসের বৈপরীত্য পাওয়া যায়, তাহলে দল বা ইমাম যত বড়ই হোক না কেন সেক্ষেত্রে রাসূলের হাদীসের অনুসরণ করাই ঈমানের দাবি। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

[২৬] *তিরমিযী, মিশকাত হা : ৬২৮৩-এর ব্যাখ্যা; ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬ হা : ৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা সহীহাহ হা : ২৭০-এর ব্যাখ্যা; শারফ, পৃ. ১৫*

[২৭] *ফাতহুল বারী 'ইলম' অধ্যায় ১/১৯৮ হা : ৭১-এর ব্যাখ্যা।*

[২৮] *আবু বকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীস পৃ. ২৭*

[২৯] *শারফ পৃ. ২৮; আহলে হাদীস আন্দোলন কি ও কেন? পৃ. ১৩*

[৩০] *আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হি.) ১/৬২ পৃ.*

[৩১] *শারফ ২৯ পৃঃ আহলে হাদীস আন্দোলন কী ও কেন? পৃঃ ১৩।*

[৩২] *তদেব।*

[৩৩] *আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ২/১৭৯ পৃ.*

[৩৪] *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ৬০*

দা'ওয়াতুন নববী শর্ত ও সতর্কতা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(১ম পর্ব)

দ্বীনের দা'ওয়াতকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে হলে অবশ্যই তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। আর তিনটি বিষয়বস্তু ব্যতীত দা'ওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা সম্ভব নয়। উক্ত তিনটি বিষয়বস্তু যথাক্রমে : আত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ, ইত্তিবাউন নাবী বা নাবী ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি। এ তিনটি বিষয় নিয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

(১) আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ : আল্লাহর একত্ববাদ, যেটাকে শারয়ী ভাষায় তাওহীদ বলা হয়, এটা দা'ওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য এবং পৃথিবীব্যাপী তাওহীদের বাণী ছড়িয়ে দেয়াই ইসলামী দা'ওয়াহর মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হলে সে দা'ওয়াহ আর শারয়ী দা'ওয়াহ থাকবে না বরং তা দুনিয়াবী স্বার্থে রূপ লাভ করবে।

কেননা তাওহীদ দুনিয়ার কল্যাণে ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র পথ এবং এটা রাসূলগণের দা'ওয়াহর মূল চাবি অর্থাৎ সমস্ত নবী ও রাসূল তাদের নিজ নিজ জাতিকে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের দিকেই আহ্বান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

আর আমরা প্রত্যেক উম্মাত তথা জাতির মাঝে রাসূল পাঠিয়ে ছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত বর্জন কর।[৩৫]

আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূলের মিশনই তাওহীদের দা'ওয়াত। সকলেই এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন এবং শিরক ও তাগূত থেকে তারা নিজ নিজ জাতিকে সতর্ক করেছেন।

আর তাওহীদের দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোনো বৈপরীত্য ও মতভেদ ছিল না। সর্বশেষ নাবী মুহাম্মদ ﷺও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন এবং তার দা'ওয়াহর মূল লক্ষ্যই ছিলো তাওহীদ।

যখন নাবী ﷺ মুয়াজয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু- কে ইয়ামানে পাঠালেন তখন তাকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে,

«إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى.

তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যেখানে তোমার প্রথম দা'ওয়াহ হবে- তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেয়।[৩৬]

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

আমাকে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মা'বুদ নেই। এটা না বলা পর্যন্ত মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৩৭]

সুতরাং দা'ওয়াত ও তাবলীগের প্রথম ও প্রধান বিষয় হলো তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ।

বিশ্বব্যাপী তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেওয়াই শারয়ী দা'ওয়াহর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাওহীদের শব্দগত অর্থ : কোনো বস্তুকে একক করে দেওয়া, কোনো কিছুর একককে মেনে নেওয়া বা স্বীকার করা, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা।

পরিভাষায় তাওহীদ হলো- প্রতিপালক, ইবাদত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাস ও স্বীকার করা।

তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

---

* *মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।*

[৩৫] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ৩৬*

[৩৬] *সহীহ বুখারী হা: ৭৩৭২*

[৩৭] *সহীহ বুখারী হা: ২৯৪৬*

(১) توحيد الربوبية বা প্রতিপালনগত একত্ববাদ।

(২) توحيد الألوهية বা ইবাদতগত একত্ববাদ।

(৩) توحيد الأسماء والصفات বা নাম ও গুণাবলীগত একত্ববাদ।

যেহেতু একজন দা'ঈর ওপর প্রথম ওয়াজিব কর্ম হলো তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো এবং কোনো মানুষই তাওহীদ ব্যতীত দ্বীনে প্রবেশ করতে পারবে না, সেহেতু দ্বীনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাস ও স্বীকার করা।

সেজন্য সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে জানা ও জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাওহীদের প্রকারভেদসহ তার পরিচিতি উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

প্রথম প্রকার : توحيد الربوبية বা প্রতিপালনগত একত্ববাদ : প্রতিপালনগত একত্ববাদ হলো : আল্লাহ কর্মের মাধ্যমে তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস ও স্বীকার করা।

যেমন : সৃষ্টি করা, মৃত্যু দান করা, জীবন দান করা, রিযক দান করা ও সবকিছুর পরিচালনা করা ইত্যাদি।

এ সকল কর্মে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকার করাই হলো প্রতিপালনগত একত্ববাদ।

সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আলে শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : প্রতিপালনগত একত্ববাদ হলো : আল্লাহ সবকিছু প্রতিপালন করেন, তিনি সবকিছুর অধিপতি, স্রষ্টা ও রিয্কদাতা।

নিশ্চয় তিনি মৃত্যুদাতা ও জীবনদাতা, উপকার ও অপকারের একমাত্র মালিক তিনিই, তিনি অসহায়ত্বের ডাকে সাড়া দানকারী, সকল কিছুর পরিচালনা একমাত্র তিনি করে থাকেন, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহীত রয়েছে, তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত কিছু করতে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং এক্ষেত্রে তার কোনো অংশীদার নেই- এসব কিছুর প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করাই হলো প্রতিপালনগত একত্ববাদ।[৩৮]

যেমন : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্ব জগৎ সমূহের প্রতিপালক।[৩৯]

আল্লাহ তা'আলা যে সমগ্র বিশ্বের একক স্রষ্টা, রিযকদাতা জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা ও সবকিছুর পরিচালক একমাত্র তিনিই এসব কিছুই মক্কার সমস্ত কাফেররা জানতো এবং বিশ্বাসও করতো। যেমন : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন, কিংবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার নেতৃত্বাধীন জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে কে বের করেন এবং সব বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে। আল্লাহ, আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না।[৪০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন; কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তাহলে কোথায় তারা ঘুরপাক খাচ্ছে।[৪১]

এ বিশ্বাস করার পরও তারা কাফির ও মুশরিক, কারণ তারা আল্লাহর উলূহিয়্যাতকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ : তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে।

শাইখ সালিহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الإيمان بالربوبية. الإيمان بالألوهية. الإيمان بأسمائه وصفاته.

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা চারটি বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। (১) আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, (২)

[৩৮] *তাইসীরু আযীযিল হামীদ- ১৭ পৃ:*

[৩৯] *সূরা আল-ফাতিহা আয়াত : ০১*

[৪০] *সূরা ইউনুস আয়াত : ৩১*

[৪১] *সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৬১*

তার রুবূবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করা, (৩) তার উলূহিয়্যাতে বিশ্বাস করা এবং (৪) তাঁর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করা।[৪২]

উল্লেখিত চারটি বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ব্যতীত কখনোই এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্ভবপর নয়। এ চারটির কোনো একটি যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে পূর্ণ কাফির এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর মক্কার মুশরিকরা রুবূবিয়্যাত তথা আল্লাহর প্রতিপালনগত একত্ববাদ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি তারা বিশ্বাসী ছিল না। বিশেষ করে তাওহীদ আল উলূহিয়্যাহ যা ইবাদতগত একত্ববাদের সাথে ছিল তাদের প্রবল শত্রুতা, যে কারণে রুবূবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করাটা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কোনো কাজে আসবে না।

দ্বিতীয় প্রকার : (২) توحيد الألوهية বা ইবাদতগত একত্ববাদ :

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা ইবাদতগত একত্ববাদ হলো : ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর এককত্ব বিশ্বাস ও স্বীকার করা।

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। এবং আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক ইবাদতের যে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, উক্ত নীতিমালা বহির্ভূত কোনো ইবাদত না করা ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা- এসব কিছুর সমষ্টিই হলো তাওহীদ আল উলূহিয়্যাহ বা ইবাদতগত একত্ববাদ।

শাইখ সালিহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

توحيد الألوهية: ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين؛ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. وهو إفراد الله- عز وجل- بالعبادة. فالمستحق للعبادة هو الله تعالى.

তাওহীদ আল উলূহিয়্যাকে তাওহীদুল 'ইবাদাহ বলা হয়। সরাসরি আল্লাহর নামের দিকে এর সম্পৃক্ততার দৃষ্টিকোণ থেকে একে তাওহীদ আল উলূহিয়্যাহ বলা হয় এবং বান্দার সাথে সংশ্লিষ্টতার দিক দিয়ে এটাকে তাওহীদুল ইবাদাহ বা ইবাদগত একত্ববাদ বলা হয়। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করাই হলো ইবাদতগত একত্ববাদ। সুতরাং ইবাদতের একমাত্র হক্বদার হলেন আল্লাহ তা'আলা ।[৪৩]

[৪২] *শারহুল আক্বিদাহ আল ওয়াসিত্বীয়াহ-৩২-৩৩ পৃ.*
[৪৩] *আল কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিদ তাওহীদ- ১/১৪ পৃ:*

যেমন : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য।[৪৪]

আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই।[৪৫]

আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

মৃত্যু না আসা পর্যন্ত একমাত্র তোমার প্রতিপালকেরই ইবাদত কর।[৪৬]

অতএব একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করার নামই হলো ইবাদতগত একত্ববাদ।

আমাদের সর্বসাধারণের ধারণা হলো, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, জুম'আর সালাত, রমাযানের সিয়াম পালন ও সামর্থ্যবান হলে কাবায় যেয়ে জীবনে একবার হজ্ব পালন করা ইবাদত। এর বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজনীতি-অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সবই ইবাদতের বাইরের জিনিস, কাজেই ধর্ম-কর্ম এটা আলাদা বিষয় এবং রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি আলাদা বিষয়। এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা মুসলিমদের মাঝে এমন ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নেওয়ার ফলে মুসলিম সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বিরাট অধঃপতন নেমে এসেছে। ইবাদত শুধু মসজিদের মধ্যেই স্বীমাবদ্ধ নয় বরং মুসলিম জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত বা তাওহীদের শক্ত অবস্থান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।[৪৭]

সুতরাং নানা সত্তার অস্তিত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য হলো এক আল্লাহর ইবাদত করা, কোনো ক্রমেই তা নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

[৪৪] *সূরা আল-আন'আম আয়াত : ১৬২*
[৪৫] *সূরা আল-ফাতিহা আয়াত : ৪*
[৪৬] *সূরা আল-হিজর আয়াত : ৯৯*
[৪৭] *সূরা আয-যারিয়াত আয়াত : ৫৬*

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة.

রাসূলগণের যবানে আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশমালা দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করাকে ইবাদত বলা হয়। তিনি আরো বলেন :

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রত্যেক কথা ও কর্ম যেগুলো আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট এমন সবকিছুর সমষ্টিকে ইবাদত বলা হয়।[৪৮]

সুতরাং ব্যক্তি পরিবারনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি এমনকি বৈশ্বিক নীতির সর্বস্তরে তার রাসূলের নির্দেশ পালন করার নামই হলো ইবাদত। আর এক আল্লাহর ইবাদত মানেই তাওহীদ বা একত্ববাদ।

আর তাওহীদ হলো দ্বীনের শুরু এবং শেষ এবং এ তাওহীদই সকল নাবী ও রাসূলগণের দা'ওয়াতের শুরু ও শেষ। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণ তাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ এ তাওহীদের দা'ওয়াতই মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার চূড়ান্ত রূপদান করেছেন। কেউ তা গ্রহণ করে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে আবার কেউ এ তাওহীদের দা'ওয়াহকে উপেক্ষা করে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

আমরা প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের কিছু সংখ্যকের ওপর ভ্রষ্টতাই যথাপোযুক্ত হয়েছিল।

অতএব, তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম যেমন হয়েছিল?[৪৯]

হাফিয ইবনু কাছির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَبَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَيْ: فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنَ النَّاسِ وَطَائِفَةٍ رَسُولًا وَكُلُّهُمْ يَدْعُو (٥) إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَيَنْهَى (٦) عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} فَلَمْ يَزَلْ تَعَالَى يُرْسِلُ إِلَى النَّاسِ الرُّسُلَ بِذَلِكَ، مُنْذُ حَدَثَ الشِّرْكُ فِي بَنِي آدَمَ، فِي قَوْمِ نُوحٍ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ نُوحٌ، وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ خَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي طَبَّقَتْ دَعْوَتُهُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ.

প্রত্যেক জাতির মাঝে আল্লাহ তা'আলা রাসূল পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ- মানুষের প্রত্যেক যুগ কিংবা প্রজন্মের মাঝে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর মাঝে আল্লাহ তা'আলা একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা থেকে নিষেধ করেছেন। তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে বেঁচে থাক।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে সর্বদা রাসূল প্রেরণ করতে থাকলেন, এমনকি বনী আদমের মাঝে শিরকের সূচনা পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখলেন।

শিরকের সূচনা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের মাঝে প্রথম সূচিত হয়, যাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আলাইহিস সালাম)- কে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন যাকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর জন্য রাসূল করে প্রেরণ করেছিলেন। তাদের সর্বশেষ রাসূল ছিলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার মাধ্যমে এ দা'ওয়াহ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তজুড়ে জ্বিন ও মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে।

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়াত ও রিসালাতের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত দা'ওয়াত ও তাবলীগের মূল বিষয়বস্তু ছিল তাওহীদ আল উলূহিয়্যাহ বা ইবাদতগত একত্ববাদ। কাজেই তাওহীদকে অবমূল্যায়ন করে বক্তৃতা ও রাজনীতির মাঠ গরম করা যেতেই পারে কিন্তু দ্বীনের মূল শেকড়ের সন্ধান পাওয়া মোটেও সম্ভব নয়। (চলবে ইন শা আল্লাহ)

[৪৮] *ফাতহুল মাজীদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ-১৪ পৃ.*

[৪৯] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ৩৬*

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প

আব্দুল্লাহ বিন আইউব*

ভূমির অভ্যন্তরে আকস্মিক যে কম্পন হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হচ্ছে। এটি কেয়ামতের অন্যতম ছোট আলামত। রাসূল ﷺ বলেন :

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض)»

অর্থ : কিয়ামত তখনই সঙ্ঘটিত হবে, যখন ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সঙ্কুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, হত্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে উপচে পড়বে।[৫০]

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অসংখ্য অগণিত নিয়ামতরাজি দান করেছেন। এসব নিয়ামতের অন্যতম বড় নিয়ামত হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন জমিনকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করার জন্য স্থিতিশীল করে সৃষ্টি করেছেন। যা অধিকাংশ মানুষ অনুধাবন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾

অর্থ : আমি কি জমিনকে বিছানাস্বরূপ এবং পর্বত মালাকে পেরেকস্বরূপ সৃষ্টি করিনি?[৫১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থ : আচ্ছা, কে জমিনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন ও তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীমালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত আর দুই সাগরের মাঝে তৈরি করেছেন এক ব্যবধান? আল্লাহর সাথে কি অন্য উপাস্য আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।[৫২]

তিনি আরো বলেন

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ : আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে স্থিতিশীল করেছেন ও আসমানকে ছাদ করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন অতঃপর তোমদের আকৃতি সুন্দর করেছেন আর তোমাদেরকে পবিত্র বস্তু থেকে রিয্ক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়![৫৩]

আর ভূমিকম্প আল্লাহর শাস্তি, জাতির অপকর্মের কারণে তিনি যখন ইচ্ছা করেন তাদের ওপর তা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾

অর্থ : হে নবী! বলুন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমাদের প্রতি ওপর দিক থেকে বা নিচ থেকে শাস্তি পাঠাতে সক্ষম বা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের সংঘর্ষের স্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম।[৫৪] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: আল্লাহ তা'আলা ওপর দিক থেকে পাথর বর্ষণ এবং নীচ থেকে ভূমিধসের মাধ্যমে শাস্তি দিতে সক্ষম।[৫৫]

---

* অধ্যয়নরত, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা, সৌদি আরব।

[৫০] সহীহ বুখারী হা : ১০৩৬

[৫১] সূরা আন-নাবা আয়াত : ৬-৭

[৫২] সূরা আন-নামল আয়াত : ৬১

[৫৩] সূরা আল-মুমিন আয়াত : ৬৪

[৫৪] সূরা আল-আনআম আয়াত : ৬৫

[৫৫] ইবনে কাসীর: ৩/২৭৬

ভূমিকম্পের কারণ : ভূমিকম্পের কারণ নিয়ে অনেক অমূলক গল্প শোনা যায়, যেমন: পৃথিবী একজন ফেরেশতার শিংয়ের ওপর রয়েছে, ওই ফেরেশতা যখন শিং পরিবর্তন করে, তখন ভূমিকম্প হয়। কুরআন-হাদীসে এ ধরনের বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই। তাছাড়া ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ : ভূমিকম্প শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত হয়; বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে কঠিন শিলা স্তরের স্থানান্তর। ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন "ভূমিকম্পের কারণ হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ বাষ্পের সংকোচন, যেমন বাতাস ও পানি সংকীর্ণ স্থানে সঙ্কুচিত হয়। ভূ-গর্ভে বাষ্প সঙ্কুচিত হলে বের হওয়ার পথ খুঁজে, তখই সেস্থানে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তবে তা আল্লাহর নির্দেশে সংঘটিত হয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সতর্ক করা"[৫৬] দ্বিতীয় ভাগ : যদিও তা প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত হয়, তবে তা আল্লাহর নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ রহস্য দ্বারা আবৃত। সেগুলো হল :

সতর্ক করা : ভূমিকম্প আল্লাহর বড় নিদর্শন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পাপাচারে নিমজ্জিত জাতিকে সতর্ক করে তাঁর দিকে ফিরে আসার সুযোগ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

অর্থ : অবশ্যই আমি তাদেরকে বড় শাস্তির আগে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।[৫৭] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

অর্থ : আমি তো শুধু ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি।[৫৮] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : ভূমিকম্প আল্লাহর নিদর্শন, এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন, যেভাবে সূর্য গ্রহণ ও অন্যান্য নিদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করেন।[৫৯]

[৫৬] *মাজমুউল ফাতাওয়া ২৪/২৬৪*
[৫৭] *সূরা আস-সাজদাহ আয়াত : ২১*
[৫৮] *সূরা বনী-ইসরাঈল আয়াত : ৫৯*
[৫৯] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৪/২৬৪*

শাহাদতের মর্যাদা লাভ : ভূমিকম্পের মাত্রা তীব্র হলে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। প্রকৃত মুসলিম এতে মারা গেলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

(الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)»

অর্থ : পাঁচ প্রকারের মৃত শহীদ : মহামারীতে মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত এবং যে আল্লাহর পথে শহীদ হল।[৬০]

আল্লাহর ক্ষমতা স্মরণ করা : পৃথিবীতে কোনো জাতি যত বড় শক্তির অধিকারী হোক না কেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতা ও শক্তির কাছে তা একেবারে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা বিশ্ববাসীকে বোঝানোর জন্যই মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্প ভৃতি দিয়ে থাকেন।

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾

অর্থ : হে নবী! বলুন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমাদের প্রতি ওপর দিক থেকে বা নিচ থেকে শাস্তি পাঠাতে সক্ষম বা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের সংঘর্ষের স্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম।[৬১]

আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করা : শুরুতে উল্লেখ করেছি আসমান ও জমিন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকা আল্লাহর বড় অনুগ্রহ। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করার পরেও তাঁর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

[৬০] *সহীহ বুখারী হা : ৬৫২*
[৬১] *সূরা আল-আনআম আয়াত : ৬৫*

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾

অর্থ : তোমরা যদি শোকরগুজার হও এবং ঈমান আন, তবে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আর আল্লাহ শোকরের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।[৬২] আসমান ও জমিন স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করেন (স্থিতিশীল রাখেন), যাতে আসমান ও জমিন স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা (আসমান ও জমিন) স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ন।[৬৩]

কিয়ামতকে স্মরণ : সময়ে সময়ে সংঘটিত ভূমিকম্প মুমিন ব্যক্তিকে কিয়ামতের সময় সংঘটিত মহাপ্রলয় ও কম্পনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا

অর্থ : সেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।[৬৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

অর্থ : হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর: নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।[৬৫] উপরোল্লিখিত রহস্য ছাড়াও আরো কিছু কারণ পাওয়া যায়। সেগুলো হল : গান বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ও মাদকতার সয়লাব :

কোনো জাতির মধ্যে নর্তকি, গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ও মাদকতার ব্যাপক বৃদ্ধি ভূমিকম্পের অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমানে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে প্রতিটি ঘরে ঘরে নাচ-গান, বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক হারে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন মাদকদ্রব্যও হাতের নাগালে পাওয়ার কারণে গ্রাম-গঞ্জ ও শহর-বন্দরের উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীরা এর প্রতি আসক্ত হচ্ছে। অথচ রাসূল ﷺ বলেন :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف»، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور»

অর্থ : রাসূল ﷺ বলেন : এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণস্বরূপ আজাব দেখা দিবে। জনৈক সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এসব আজাব কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন : যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তার লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব হবে।[৬৬]

পাপাচার : গান-বাজনা, মাদক ছাড়াও অন্যান্য পাপাচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলেও আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন শাস্তি পৃথিবীতে নেমে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

অর্থ : মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৬৭] ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আল্লাহর অবাধ্যতার প্রভাবে পৃথিবীতে ভূমিধস ও

[৬২] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৪৭*
[৬৩] *সূরা ফাতির আয়াত : ৪১*
[৬৪] *সূরা আল-মুয্যাম্মিল আয়াত : ১৪*
[৬৫] *সূরা আল-হাজ্জ আয়াত : ১*
[৬৬] *হাদীসের মান: হাসান, সুনান আত-তিরমিযী হা : ২২১২*
[৬৭] *সূরা আর-রূম আয়াত : ৪১*

ভূমিকম্প সংঘটিত হয় এবং জমিন থেকে বরকত তুলে নেওয়া হয়।[৬৮]

আমাদের করণীয় :

তওবা ও ক্ষমা প্রর্থনা করা : আমরা ইতিঃপূর্বে আলোচনা করেছি ভূমিধস, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি মানুষের পাপাচারের ফসল। তাই এগুলো সংঘটিত হলে বা সংঘটিত হওয়ার কোনো আলামত প্রকাশ পেলে একনিষ্ঠচিত্তে যাবতীয় পাপাচারের জন্য ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।[৬৯] বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : ভূমিকম্প, সূর্যগ্রহণ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি নিদর্শনের সময় দ্রুত আল্লাহর কাছে ফিরে আসা, অনুনয় বিনয় করা, নিরাপত্তা চাওয়া, বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। যেভাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্যগ্রহণের সময় বলেন :

فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره

অর্থ : তোমরা যখন তা দেখতে পাবে, তখন ভীত আবস্থায় আল্লাহর জিকির, দু'আ এবং ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ধাবিত হবে।[৭০]

দান সাদকাহ করা :

দান সাদকাহ করার মাধ্যমে বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত দূরীভূত হয়। তাই সর্বাবস্থায় দান সাদকাহ করা। বিশেষ করে বিপদ-আপদ আসার সংকেত পেলে বা বিপদ আসার পর ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সামর্থ্যানুযায়ী সহযোগিতা করা। উমর ইবনে আব্দুল আজিজের সময় ভূমিকম্প সংঘটিত হলে তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন: ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। সুতরাং যে সাদকাহ করতে সামর্থ্যবান সে যেন তা করে।[৭১]

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সকল ধরনের বিপদ-আপদ এবং গজব থেকে আশ্রয় চাওয়া। বিশেষ করে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করা। রাসূল সল্লাল্লাহু (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সকাল-সন্ধ্যার একটি দু'আ হচ্ছে-

« لم يكن رسول الله صلي الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللَّهُمَّ إني أسالُكَ العفوَ والعافيَةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللَّهُمَّ استُر عورَتي -وقال عُثمان: عوراتي- وآمِن رَوْعَاتي، اللَّهُمَّ احفظني مِنْ بين يدىَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شِمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَال مِن تحتي".

অর্থ : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এসব দু'আ পড়া ছেড়ে দিতেন না। হে আল্লাহ! আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমার দোষত্রুটিগুলো ঢেকে রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ হতে আমকে নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ! আমাকে আমার সম্মুখ দিক হতে, পেছন দিক হতে, ডান দিক হতে, বাম দিক হতে এবং ওপর দিক হতে হেফাজত করুন। হে আল্লাহ ! আপনার মর্যাদার ওয়াসিলায় মাটিতে ধসে যাওয়া হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।[৭২]

পরিশেষে বলব, সমসাময়িক সময়ে সংঘটিত ভূমিকম্প থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

---

[৬৮] *জওয়াবুল কাফি ১/১৬০*
[৬৯] *সূরা আল-আনফাল আয়াত : ৩৩*
[৭০] *সহীহ বুখারী- ১০৫৯, মাজমুউল ফাতওয়া : বিন বায (রহি:) ৯/১৫১*
[৭১] *সীরাতে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, আবু মুহাম্মদ আল মিসরী পৃ : ৬৪*
[৭২] *হাদীসের মান : সহীহ, সূনানে আবি দাউদ হা : ৫০৭২*

অদৃশ্য জগতের গল্প

ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ *

আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্রষ্টা। যিনি আসমান-জমিনে অসংখ্য সৃষ্টি-জীবকে সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। 'ফেরেশতা' সেসব সৃষ্টির অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের লোকচক্ষুর আড়ালে সৃজন করেছেন এবং তাঁদের ধরন-গঠন, দায়িত্ব-কর্তব্য ও চাল-চলনের সংবাদ দিয়ে আমাদেরকে তা বিশ্বাস করতে বলেছেন। তাই তো ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

কোনো ব্যক্তি মুমিন হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। বিষয়গুলো হল, আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, নাবী-রসূলগণ ও শেষ দিবস এবং বিশ্বাস স্থাপন করা তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি। এগুলোকে বলা হয় ঈমানের রুকন। এসব বিষয় বিশ্বাস না করে মুমিন হওয়ার দাবি অনর্থক।

কোনো বিষয় বিশ্বাস করতে হলে, সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অজানা কোনো বিষয়কে বিশ্বাস করা যায় না। আর সে জ্ঞান অর্জন সম্ভবপর হয় দুটি মাধ্যমে; ১. পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ২. প্রামাণিক বিবরণের মাধ্যমে। ফেরেশতা একটি অদৃশ্য বিষয়, যাদের আমরা চোখে দেখতে পাই না, তাই তাদের সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে কুরআন-সুন্নাহের বিশুদ্ধ বিবরণ থেকে। তাই এ মাধ্যম ব্যবহার করেই আজ আমরা ফেরেশতাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

◆ ফেরেশতা কারা?

ফেরেশতারা অদৃশ্য জগতের অংশ, যাদের আমরা দেখতে পাই না। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং তার রসূলের ভাষায় ফেরেশতাদের ব্যাপারে অনেক সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন।

◆ ফেরেশতা কিসের সৃষ্টি?

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে :

قالت عَائِشَةُ رضي الله عنها : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ"

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর হতে। জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা হতে। আর আদমকে যা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার বিবরণ তোমাদের দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ মাটি হতে)।[৭৩]

◆ ফেরেশতাদের কখন সৃষ্টি করা হয়েছে?

ফেরেশতাদের কখন সৃষ্টি করা হয়েছে তার কোনো নির্দিষ্ট সময় আমাদের জানা নেই। কারণ কুরআন-সুন্নায় এ ব্যাপারে কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তারা মানুষের পূর্বে সৃষ্ট। কারণ কুরআনে এসেছে :

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (মানুষ) বানাবো।[৭৪]

আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে মানব সৃষ্টির ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, তারা তখন অস্তিত্বশীল ছিল।

◆ ফেরেশতাদের আকৃতি :

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের ব্যাপারে বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

* মাদরাসা খাইরুল উম্মাহ, চট্টগ্রাম।
দাওরায়ে হাদীস : মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

[৭৩] সহীহ মুসলিম হা : ২৯৯৬
[৭৪] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৩০

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেকে এবং পরিবারকে সে আগুন (জাহান্নাম) হতে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর যা আদেশ অমান্য করে না বরং তিনি যা আদেশ করেন তারা তাই পালন করে।[৭৫]

সামগ্রিকভাবে তাঁদের মাঝে সবচেয়ে বড় ও প্রধান হলেন জিবরাইল ﷺ। হাদীসে তার সম্পর্কে যে বিবরণ এসেছে তা হল :

قال رسول الله واصفا جبريل : " رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ "

রসূল ﷺ বলেন : আমি তাকে আসমান হতে নামতে দেখেছি এমন অবস্থায় যে, তার বৃহদাকৃতি আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে আড়াল করে ফেলেছে।

আরেকদল বৃহদাকৃতির ফেরেশতা হলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা। তাদের বিবরণে এসেছে :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ "

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন : আমাকে আল্লাহর ফেরেশতাদের মধ্য হতে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের ব্যাপারে সংবাদ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় তার কানের লতি হতে কাঁধের ব্যবধান সাতশ' বছরের দূরত্ব পরিমাণ।

◆ **ফেরেশতাদের গঠন ও প্রকৃতি :**

১. তাদের ডানা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شئ قدير.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, ফেরেশতাদেরকে বাণী বাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

২. তারা সুন্দর অবয়বের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা জিবরাইল ﷺ-এর বিবরণ দিয়ে বলেন :

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى () ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾

তাকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল শক্তিধর। (যিনি)

সৌন্দর্য্যের অধিকারী। অতঃপর সে (জিবরীল) স্থির হয়েছিল।

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : ذو مرة অর্থ হল উত্তম চেহারা। কতাদা রহ. বলেন : এর অর্থ হল, লম্বা ও সুন্দর আকৃতির অধিকারী।

গঠন-আকৃতিতে তাদের মাঝে পার্থক্য আছে, যেমন পার্থক্য আছে মর্যাদার ক্ষেত্রে। তাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন, সেসব ফেরেশতা যারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হাদীসে এসেছে :

مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ : مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلائِكَةِ.

মুয়াজ বিন রিফা'আ বিন রাফে আয-যুরাকী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, (আর তার পিতা বদরী সাহাবী ছিলেন)। তিনি বলেন : জিবরীল ﷺ রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আপনারা আপনাদের মাঝে বদরী সাহাবীদের কিরূপ (সম্মানিত) মনে করেন? রাসূল বললেন : সর্বোত্তম মুসলিম বা এ জাতীয় কিছু বললেন। জিবরীল বললো : ফেরেশতাদের মধ্যে যারা বদরে শামিল হয়েছে, তারাও অনুরূপ।

৩. ফেরেশতারা খায় না এবং ঘুমায় না।

[৭৫] *সূরা আত-তাহরীম আয়াত : ৬*

ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) নিকট মেহমানরূপে ফেরেশতাদের আগমনের ঘটনা থেকে এটি বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন :

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم .

তখন তিনি (ইবরাহীম) তার পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। (তারা খাচ্ছে না দেখে) তিনি বললেন, আপনারা কি খাবেন না? এবং ভয় পেলেন। তখন তারা বললো, আপনি ভয় পাবেন না। আর তারা তাকে একজন জ্ঞানবান সন্তানের সংবাদ দিলেন।

৪. আল্লাহর ইবাদাত ও জিকির করে তারা ক্লান্ত বা বিরক্ত হন না। আল্লাহ বলেন :

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা শিথিলতা দেখায় না।[৭৬]

অন্যত্র আছে,

﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾

যারা তোমার রবের নিকটে রয়েছে তারা দিন-রাত তাঁরই তাসবীহ পাঠ করছে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।[৭৭]

◆ **ফেরেশতাদের সংখ্যা :**

ফেরেশতাদের সংখ্যা এত বেশি যে, তার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানেন না। বাইতুল মামুরের বিবরণে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم .

অতঃপর আমার সামনে বাইতুল মামুরকে উপস্থাপন করা হল। আমি জিবরীলকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : এটি হল 'বাইতুল মামুর'। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। তারা একবার বের হলে আর ফিরে আসার সুযোগ পান না।[৭৮]

অন্যত্র আছে :

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا.

আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে আনা হবে, তখন তার ৭০ হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে থাকা ৭০ হাজার ফেরেশতা তাকে টানতে থাকবে।[৭৯] (চলবে ইন শা আল্লাহ)

ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে জিজ্ঞাসা করা হল: আপনার কোন কথা যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত হয়, তখন আমরা কি করব? তিনি বললেন : আল্লাহর কিতাবের মোকাবেলায় আমার কথা পরিহার করবে। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হল : আপনার কথা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিপরীত হয় তাহলে আমরা কি করব? তিনি বললেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথার মোকাবেলায় আমার কথা পরিহার করবে। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হল : যদি আপনার কোন কথা সাহাবাদের কথার বিপরীত হয় তাহলে কি করব? তিনি বললেন : সাহাবাদের কথারও বিপরীতে আমার কথা পরিত্যাগ করবে।

(ইকদুল জীদ পৃষ্ঠা : নং ৫৩)

[৭৬] *সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত : ২০*
[৭৭] *সূরা ফুসসিলাত আয়াত : ৩৮*
[৭৮] *সহীহ বুখারী হা : ৩২০৭*
[৭৯] *মুসলিম*

প্রেম অগ্নিদহন যন্ত্রণা

সাইদুর রহমান*

প্রিয় হে! জীবন সায়াহ্নে তোমাকে দু'চারটি কথা বলবো, যা আমি বহুদিন যাবৎ বুকে লালন করে এসেছি। প্রতিটি কথাই বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো। তুমি ক্ষণিকের জন্যে কানটা সটান করো। লেখাপড়াকালে কখনো ভুল করেও প্রেম রাজ্যের অলিগলিতে হামাগুড়ি দেবে না। এর বিষক্রিয়া তুমি সহ্য করতে পারবে না। সহ্য করার মতো তোমার যে শক্তি সামর্থ্য নেই। আবারো বলছি, আমার কথাগুলো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করো। তুমি তোমার আশপাশে অনেককেই দেখবে প্রেম সাগরে অবগাহন করছে। এই সাগরের চোখ ধাঁধানো শীতল পানি থেকে ক্ষণকালের জন্য তনুমন শিহরিত করছে। মাঝেমধ্যে তোমার কাছে এসে শেয়ার করছে উৎফুল্লতার গল্পের ঝুড়ি। অবচেতন মনে তোমারও মন চাইবে প্রেমের শীতলতা থেকে একটু গা-টা শিহরিত করে নেই, চেখে নেই প্রেমের যৎসামান্য মিষ্টতা। আমিও প্রেমের অপলাপ আড্ডায় মজে থাকি। না, কখনো করা যাবে না। এটা হীমশীতল পানি নয়। নরকের অনল। পা দিলেই পরক্ষণেই ভস্মীভূত হয়ে যাবে তোমার গোটা দেহ। কত নিষ্পাপ দেহকে দেখেছি উদ্দীপনার সাথে সদা সর্বদা প্রাণবন্ত হয়ে লেখাপড়ার মজায় মগ্ন থাকতো। দু'দণ্ড সময় মিলতো না কারো সাথে একটু আলাপচারিতায় নিমগ্ন হওয়ার। পড়ালেখা আর পড়ালেখা। কিন্তু কোনো একদিন শয়তানের ফাঁদে পড়ে ভুলে চলে যায় প্রেম রাজ্যের চোরাবালিতে। শত চেষ্টা করেও আর ফিরে আসতে পারেনি এ চোরাবালির মুখ থেকে। পরিশেষে ভূগর্ভস্থে বিলীন হয়ে গেছে। কেউ জানে না তার অস্তিত্বের খবর। কিছুকাল পূর্বেও তার লেখাপড়ার গতি ছিল কিংবদন্তিতুল্য। সময়ের পরিক্রমায় এখন সে মানুষের উপমাতে পরিণত হয়েছে।

কত বালককে আমি দেখেছি শেলফের সাথে মাথা ঠুকরিয়ে গুঙ্গিয়ে কাঁদতে। ছায়াঘেরা বিকেলে যখন আমরা খুনসুঁটি আর খোশগল্পে মজে থাকতাম, তখন সে চেহারা কালো করে নিরবে-নিভৃতে একা একা বসে থাকতো। তার দেহাবয়ব দেখলেই মনে হতো তার ভেতরে লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু চোখলজ্জায় সে কাউকে কিছু বলতে পারতো না। চিন্তা, বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তাকে তিলে তিলে আমার চোখের সামনে শেষ করে দিয়েছে। অতএব, আমার ছেলে, ভুলেও এ জগতে পা বাড়াবে না। প্রেমঅগ্নি দহনের যন্ত্রণা যে কত পীড়াদায়ক তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। এটা শুধু তারাই বুঝবে যারা এ অনলে পা দিয়েছে। তোমাকে সতর্ক করার মানসে আজ এই লেখাটা। ভীষণ মনোযোগ দিয়ে পড়বে। শুধু তোমাকে নিবৃত রাখার জন্য আমি কষ্ট করেছি। প্রেম অগ্নির কিছু কুফল তোমার সাথে শেয়ার করছি।

(১) আল্লাহর কাছ থেকে শাস্তি :

আল্লাহ বলেন

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

'জলে ও স্থলে যে বিপর্যয় আপতিত হয়ে থাকে তা মানুষের হস্তের উপার্জন। যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এ জন্য তিনি তাদেরকে তাদের অপকর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করান।'[৮০]

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

'আমরা তাদের বড় শাস্তি দেয়ার পূর্বে ছোট শাস্তি দিয়ে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে।'[৮১]

আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি দু'ভাবে হয়ে থাকে। শারীরিক ও মানসিক। রাত জেগে প্রেয়সীর সাথে অহেতুক প্রণয়ের আলাপে মজে থাকলে ফুটফুটে সজীব সতেজ চেহারাও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। চোখের পাপড়ির নিচে কালো রেখা পড়বে, মুখে ব্রনের দেখা মিলবে, চেহারা মলিন হয়ে যাবে, শরীরের ওজন কমে যাবে, চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে, ভেঙে যাবে ও যৌন সমস্যা দেখা দেবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা রাত নির্ধারণ করেছেন ঘুমের জন্য। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি, পরিশ্রমের দরুণ দুর্বলতার বড়সড় আস্তরণ ঘুমানোর

---

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৮০] সূরা রূম আয়াত : ৪১

[৮১] সূরা আস-সাজদাহ আয়াত : ২১

মাধ্যমে ডিলিট হয়ে যায়, পুনরায় ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া সজীবতা, উদ্যম। প্রভাতে ফুরফুরে চাঙা মন নিয়ে আমরা আবার কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ি। বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে গোটা দিন ঘুমালেও রাতের ছুটে যাওয়া প্রাণবন্ত ঘুম পোষাবে না। আরে ভাই, রাতকে তো আল্লাহ নির্ধারণই করেছেন ঘুমের জন্য। রাতের ঘুম মহান রবের পক্ষ থেকে পরম অনুগ্রহ, যা বেখেয়ালিপনা ও অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে।

তুমি আমাকে বলো তো সারারাত ওই তরুণীর সাথে কিসের আলাপ করেছ? গোটা রাতের অর্ধেকের বেশি সময় তো শুধু তার সাথে রাগ অভিমানের ঝুলি উপস্থাপনের মাধ্যমেই কেটেছে। কখনো হেসেছো, কখনো কেঁদেছো কখনো অভিমান করেছ আবার কখনো বা রোমান্টিকতার দরিয়ায় ডুব দিয়ে খানিকটা শীতলতা অনুভব করেছ। একটু সময় করে মুক্তমনে চিন্তা-ভাবনার খাতায় আঁকিবুঁকি দাও তো। কী আবল-তাবল না বললাম রাতভর! কিছু তো শুরু-শেষ খুঁজে পাচ্ছি না! কী লাভ হয়েছে? বলতে পারো সাময়িকের জন্য একটু ভালোবাসার মজা চেখেছি। আমি বলবো, এটা হলো শয়তানের ভীষণ বড় ধোঁকা। তুমি তো বুঝতে পারলে না। তুমি তো মরীচিকার পেছনে ঘুরছো। দিন শেষে দেখবে রিক্তহস্তে ফিরবে। শুধু অযথা তোমার জীবন ও গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হবে। মানসিক শান্তি কী পাবে জানো? তুমি খেতে পারবে না, বমি আসবে। মনে হবে ভেতর থেকে সব বের হয়ে আসছে। চিন্তা বিষণ্নতার কারণে তুমি কিছুই করতে পারবে না। সবকিছু বিরক্তিকর লাগবে। কাছের মানুষগুলোর কথা বিদ্বুটে ও তিতা লাগবে। মন মেজাজ স্বাভাবিক থাকবে না। কিছুটা উগ্র বনে যাবে। পড়ালেখা, কাজকারবার কোনো কিছুতেই মন থাকবে না। এক কথায় বলতে গেলে তুমি অস্বাভাবিক হয়ে যাবে। ক্ষণে-ক্ষণে তোমাকে তার স্মৃতিগুলো প্রকাণ্ড বিষাক্ত সাপ হয়ে কামড়াতে থাকবে। আর তুমি ভেতরে ভেতরে হাউমাউ করে চিৎকার করতে থাকবে; কিন্তু দেউ দেখবে না, কেউ শুনবে এই করুণ আর্তনাদের সুর। তুমি একা একা কষ্ট পেতে পেতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। মাঝেমধ্যে যদি কোথাও বেড়াতে যাও মনটা একটু প্রাণবন্ত করার মানসে, আর সেখানে হুট করে কোনো কথা তোমার কর্ণকুহরে ভেসে আসে, যা তুমি ইতঃপূর্বে তোমার প্রেমিকার সাথে সঙ্গোপনে বলেছো তাহলে সাথে সাথে এসব কথা রশি হয়ে তোমার টুঁটি চেপে ধরবে। মুহূর্তের মধ্যে তোমার আনন্দোল্লাস বিলীন হয়ে যাবে, তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাবে। গোটা পৃথিবীটা বিশাল প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। এ বসুন্ধরায় তোমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। মানসিক বিষণ্নতা এমন, যা বলা নেই, কওয়া নেই হুট করে চলে আসে। তুমি না চাইলেও আসবেই। কত বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও আত্মীয় স্বজন তোমাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাবে; কিন্তু তোমার যন্ত্রণার আগুন তাদের সান্ত্বনার পানিতে নিভবে না। তাই আবারও বলছি, একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখো|

(২) তুমি অপমানিত হবে।

তোমাকে একটা উদাহরণ দেই। ধরো, তুমি অনেক ভালো ছেলে। সত্যি সত্যি এই তরণীকে ভালোবাস। তাকে বিয়ে করার মানসেই প্রেম করছো। আর মেয়ের বাবা কোনো পন্থায় জেনে গেছে যে, তুমি তার মেয়েকে ভালোবাস। এরপর তুমি তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছ। দেখবে তোমার প্রস্তাব নাকচ করে দেবে। কিছুতেই মেনে নেবে না। কারণ প্রেম ভালোবাসাকে মোটামুটি গার্ডিয়ানরা অপছন্দ করে। তোমার প্রেমের এ গল্প যদি কেউ জানতে পারে তাহলে তোমাকে নিন্দার চোখে দেখবে। তোমার কোনো কথা শুনবে না। আত্মীয়-স্বজন তোমার পেছনে তোমার সমালোচনা করবে। তুমি যদি শিক্ষক হও তাহলে ছাত্ররা তোমার কথা শুনবে না। কারণ ইতিহাস তোমাকে ছাড় দেবে না। তুমি যদি মহা জ্ঞানীও হয়ে যাও, তথাপি লোকে বলবে, হুঁ, দেখেছি তাকে। কিছুদিন আগেও ওমুক মেয়ের সাথে প্রেম করে বেড়াতো। এখন মুসল্লি সেজেছে। বকধার্মিক। সে তো নিজেই ভালো না। নিজেই তো আমল করে না আবার অন্যদের উপদেশ দেয়। কত কথা যে তুমি শুনতে পাবে তার ইয়াত্তা নেই। সাবধান হও।

(৩) দারিদ্র্য আসবে।

রাতভর কথা বলতে তো টাকা খরচ হবে, তাই না? অহর্নিশি কথা বললে তোমার পকেটের টাকা শেষ হয়ে যাবে। আমি একজনকে দেখেছি। অনেক টাকা ছিল; কিন্তু তার রোগ ছিল শুধু প্রেম করা। রিকশা, সিএনজি ও গাড়ির গ্যারেজ ছিল। সময়ের পালাবদলে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন সে অন্যের সিএনজি চালায়; অথচ কিছুকাল পূর্বে সে নিজেই কয়েকটি সিএনজির মালিক ছিল। এখন কথা হলো দারিদ্র্য আসবে কেন। তাহলে তোমাকে দুই একটা আয়াত শোনাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾

তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে অজস্র বারি বর্ষণ করবেন, তোমাদের মাল ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিবেন এবং উদ্যান দান করবেন ও নদী প্রবাহিত করে দিবেন।[৮২]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি ক্ষমা প্রার্থনা করো তাহলে মাল সম্পদ বাড়িয়ে দিবো। এখন কথা হলো ক্ষমা প্রার্থনা করলে যদি মাল বাড়িয়ে দেন তাহলে এর বিপরীতে গুনাহ করলে অবশ্যই মাল কমে যাবে। এজন্যই কেউ প্রেম করলে শাস্তিস্বরূপ তার দারিদ্র্য দেখা দেবে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الرجلَ لَيُحرَمُ الرِّزقَ بالذَّنبِ يُصيبُه.

'পাপ করার কারণে ব্যক্তি রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।'[৮৩]

(৪) আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হবে।

প্রেমে ছ্যাকা খেয়ে কত প্রাণ যে আত্মহত্যা করেছে! অনেকে তো প্রেমিকা অন্যের ঘরে চলে যাবে এটা দেখে সহ্য করতে পারবে না বিধায় প্রেমিকাকেই চিরতরে এ বসুন্ধরা থেকে বিদায় করে দিয়েছে। এমনও ঘটনা ঘটেছে, কয়েক বন্ধু মিলে প্রথমে ধর্ষণ করেছে, তারপর মেরে ফেলেছে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। প্রেমে ছ্যাকা খেলে জীবনটা একেবারে বিষাদময় হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয়। শয়তান তো আরো আছে ফুসলানোর জন্য। সে মনের ভেতর উস্কানি দেয়, 'কার জন্য বেঁচে থাকবি। যাকে নিয়ে এত স্বপ্ন লালন করেছিলি, সে তো আজ অন্যের ঘরে রে। এ জীবন রেখে কী লাভ। শেষ করে দে এই জীবন।' অবশেষে শয়তান চলে গেছে। এবার তুমি পা বাড়াও আত্মহত্যার দিকে। শয়তান তোমার চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়ে গেল। তোমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে সে বড্ড খুশি আজ। আর তুমি তার সাথে হেরে এখন দীর্ঘদিন জাহান্নামের লেলিহান অগ্নির শাস্তি চাখো। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সতর্ক করে বলেছেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

'তোমরা নিজেদের হত্যা করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহশীল) "

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। অনুগ্রহ করো। নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন'

নবী ﷺ তাঁর উম্মত যেন আত্মহত্যা না করে এজন্য সতর্ক করে বলেন :

" مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " .

'যে ব্যক্তি কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা সে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে তথায় সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষপান করতে থাকবে, এভাবে তথায় সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি নিজে পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে নীচে গড়িয়ে জাহান্নামের আগুনে পড়তে থাকবে, এভাবে সে ব্যক্তি তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।'[৮৪]

শেষ পর্যন্ত তুমি চিরশত্রু শয়তানের কাছে পরাজিত হলে।

(৫) মা বাবার অবাধ্য হবে।

প্রতিটি মা-বাবা মনে প্রকাণ্ড একটা স্বপ্ন বুনন করে। আমার ছেলেকে ধুমধাম করে বিয়ে করাবো, আমার মেয়েকে লাল টুকটুকে করে বউ সাজিয়ে মহানন্দের সাথে ধুমধাম করে বিয়ে দিবো। একি! মেয়ে তো অপরিচিত এক ছেলে নিয়ে

[৮২] *সূরা আন-নূহ আয়াত : ১০-১২*
[৮৩] *ইবনে মাজাহ হা : ৩২৬৪*
[৮৪] *সহীহ মুসলিম হা : ২০০*

উধাও। বলা নেই কওয়া নেই হুট করে কোথায় যেন চলে গেল। দু'দিন কোনো হদিস নেই। দু'দিন পর জানা গেল বিয়ের খবর। বাবা-মার সারা জীবনের স্বপ্ন নিমিষেই ডুবে গেল। সন্তানকে নিয়ে কত গৌরব করতো মানুষের সাথে। এক অঘটনের তাণ্ডবে সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। একটা ছেলে বা মেয়ের ফাঁদে পড়ে অবাধ্য হলে পরম আত্মীয় পিতা-মাতার। অনেকে তো আবার প্রেমে ছ্যাকা খেয়ে চিরকুমার হয়ে থাকে। জীবনে আর বিয়ে করবে না। বাবা-মা হাজার বললেও কথা গায়ে মাখে না। এই পাগল! তুমি চিরকুমার থাকলে তোমার প্রেয়সীর বাবা-মা কিন্তু তাকে ঠিকই বিয়ে দিয়ে দিবে বা দিয়ে ফেলেছে। কার জন্য নিজের জীবন নষ্ট করছো? 'একটা কথা কান লাগিয়ে শুনো, কারো জন্য নিজের জীবন নষ্ট করতে নেই।' তুমি যার জন্য মুখ গুমরা করে বসে আছো সে কিন্তু দিব্যি হেসে খেলে সময় পার করছে। সে যদি তোমাকে ছাড়া ভালো থাকতে পারে তাহলে তুমি তাকে ছাড়া কেন ভালো থাকতে পারবে না। আমি জানি আমার কথাগুলো তোমার কাছে মহা ভারী ঠেকছে। মনে মনে বলছো, 'আরে মিয়া আপনি কী বুঝবেন বিরহ যাতনার কথা। উপদেশ দেয়া খুবই সহজ; কিন্তু পালন করা বহু কঠিন।' এই ছেলে, তুমি তো শুরুতেই ভুল করলে। কেন গেলে ওই টিপাইমুখের ধারে। কোন শয়তানের কথা শুনে এ কাজ করলে? এখন যতই কষ্ট হোক এখান থেকে যে তোমাকে সোজা হয়ে বাড়ির পথে রওনা দিতে হবে। আমার ওপর এতো গোস্যা করছো কেন? তুমি তোমার বাবা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু পরখ করো। তাদের নিয়ে একটু ভাবো। তাদের স্বপ্নটা নষ্ট করে দিয়ো না। আবারো ভাবো। বাবা-মাকে কষ্ট দিলে, কিন্তু এ পৃথিবীর তল্লাটেই তোমাকে শাস্তি পেতে হতে হবে। কিছু অপরাধ করলে আল্লাহ পৃথিবীতেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। এর মাঝে অন্যতম হলো পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। মা-বাবার কথা না শুনে প্রেম করে যাকে বিয়ে করলে সে তো তোমার সাথে মিলবে না। ক'দিন পরপর মন কষাকষি হবে। এক পর্যায়ে দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদের কালো আবরণ পড়বে। এজন্যই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রেমের বিয়েগুলোর অধিকাংশই পরবর্তীতে টেকেনি, বিচ্ছেদ ঘটেছে। কীভাবে সম্পর্ক অটুট থাকবে বলো তো। এ বিয়েতে তো তোমার মা-বাবার অমত ছিল। তাই বলছি, বাবা-মার অবাধ্য হয়ো না।

(৬) অন্তর মরে যাবে ও নেক কাজ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।[৮৫]
নবী ﷺ বলেছেন :

﴿ذاقَ طعمَ الإيمانِ من رضيَ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ نبيًّا﴾

'ওই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হবে।[৮৬]

প্রিয় হে! তুমি তো আল্লাহ যে ভালোবাসা পাওয়ার হকদার ছিলেন এটা দিয়ে দিয়েছো এক রমণীকে। তোমার অন্তর তো এ কারণে মরে গেছে। তুমি তো ঈমানের স্বাদ পাবে না। নেক কাজ করতে ভালো লাগবে না। সালাতে মন বসবে না। কেমন জানি সবকিছু বিরক্তিকর মনে হবে। তোমার হৃদয়ে কারো উপদেশের শীতল বাণী প্রবেশ করবে না। তোমার হৃদয়ের মুখ তো পাপের আবরণে ঢেকে আছে। তুমি দেখবে একপর্যায়ে তুমি গাফেল-উদাসীন হয়ে যাচ্ছ। তোমার মাঝের পরিবর্তন সকলের নজর কাড়বে। কিন্তু তুমি এ উদাসীনতা থেকে ফিরতে পারবে না। কীভাবে তুমি ফিরবে? অন্তর তো আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরে আসে উদাসীনতায়। আর তুমি তো আল্লাহ স্মরণে মগ্নই হতে পারছো না। সালাতে দাঁড়ালে তার কথা মনে পড়ে। কীভাবে হেসে-খেলে গোটা রাত অতিবাহিত করেছো তা মানসপটে ভেসে ওঠে। সবাই দেখবে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। শুধু তুমি একাই সবকিছুতে পিছিয়ে আছো। আমি তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি যদি মসজিদে না আসো তাহলে তোমার পরিবর্তে আরেকজন কিন্তু ঠিকই আসবে। তুমি কুরআন পড়ে যদি ভুলে যাও তাহলে অন্য কেউ কিন্তু ঠিকই কুরআন মুখস্থ করবে। তুমি আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেলে আরেকজন কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অবিরত চেষ্টা করেই বেড়াবে। মাঝখান থেকে তুমি আল্লাহর থেকে দূরে সরে গেলে। তুমি জাহান্নামের আগুনের সন্নিকটে

[৮৫] *সূরা আর-রা'দ আয়াত : ২৮*
[৮৬] *সহীহ মুসলিম হা : ৩৪*

হলে। তুমি পাপ-পঙ্কিলতার আস্তরণে পড়ে রইলে। আল্লাহর কিছুই হলো না। মনে রেখো, তুমি আল্লাহকে ছেড়ে দিলে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে ছেড়ে দিলে তোমার সমস্যা আছে। তুমি আল্লাহকে না ডাকলে তোমাকে ছাড়া আল্লাহকে ডাকার মতো অজস্র বান্দা রয়েছে। তোমার পরিণতি নিয়ে এখনো সময় করে একটু ভাবো। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন, যে নাকি তোমাদের মতো হবে না।[৮৭]

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের শেষ করে দিয়ে অন্যদের নতুন করে নিয়ে আসবেন।[৮৮]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মাঝে কেউ নিজ দ্বীন থেকে ফিরে চলে গেলে আল্লাহ অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন ও তারাও তাঁকে ভালোবাসবেন। তারা মুমিনদের প্রতি থাকবে কোমল ও কাফেরদের প্রতি থাকবে কঠোর।[৮৯]

(৭) আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে ও দু'আ কবুল হবে না।

গোপনে প্রেম করে বেড়ালে নিশ্চিত আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহর কাছে এর থেকে আশ্রয় চাই। কোন দো'আ করলে তিনি তা কবুল করবেন। চিন্তা-বিষণ্নতা থেকে দূরে থাকার জন্য দু'আ করলে তা কবুল হবে না। কারণ মহান রব তো তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। তুমি খেয়াল করে দেখবে তোমার প্রার্থীত বিষয় তুমি দু'আ করে পাচ্ছো না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই পাপ। আমি অনেককে বলতে শুনেছি, কত দো'আ করছি কোনো দো'আই তো কবুল হচ্ছে না। দো'আ কবুল হবে কীভাবে! রাস্তা তো বন্ধ হয়ে আছে। আগে পাপ থেকে বিরত থাকো তারপর দো'আ করো। অবশ্যই তোমার দো'আ কবুল হবে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রেমের আরো অনেক কুফল বর্ণনা করেছেন। তুমি আর গাফলতির মাঝে থাকবে না। ফিরে আসো আপন নীড়ে। সন্ধ্যা যে ঘনিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসো। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সুবোধ দান করুন, আমীন ❑❑

মাহে রমাযান

–মাহফুজুর রহমান

নীল গগনের পশ্চিমাকাশে
নতুন চাঁদ মুচকি হেসে
জানান দেয় এসেছে দ্বারে
মাহে রমাযান।

ওঠো মুমিন ওঠো জেগে
প্রত্যেক রাতের শেষভাগে,
ক্ষমা চাও প্রভুর তরে
হাত তুলে তার দ্বারে।
প্রভুর সন্তুষ্টি কর অর্জন
রেখে রোজা শাহরে–রমাযান।

সকল মিথ্যা কর বর্জন
তাহলে তুমি পাবে মার্জন,
করো বেশি তিলাওয়াতে কুরআন
এসেছে যে দ্বারে
মাহে রমাযান।

(অধ্যয়নরত সানুবিয়া দ্বিতীয় বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা)

[৮৭] *সূরা মুহাম্মদ আয়াত : ৩৮*
[৮৮] *সূরা ইবরাহীম আয়াত : ১৯*
[৮৯] *সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ৫৪*

শুব্বান পাতা | صفحةالشبان

যাকাত : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

তাওহীদ বিন হেলাল*

যাকাত আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ কমিয়ে ফেলে মনে হলেও সামাজিকভাবে এর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে অশান্তির অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। অবাক করা বিষয় হল, সম্পদের স্বল্পতা নয়, বরং কতিপয় মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত থাকাই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই উক্ত প্রবন্ধে যাকাতের স্বরূপ, উপকারিতা, প্রায়োগিক রূপ ও উপযোগিতা ধর্মীয় এবং বাস্তবিক তত্ত্বের আলোকে পর্যালোচনা করা হবে।

১. যাকাতের পরিচয় :

যাকাতের শাব্দিক অর্থ অনেক। যথা :

البركة (বরকতময় হওয়া)

النماء (প্রবৃদ্ধি)

الطهارة (পবিত্রতা)

الصلاح (পরিশুদ্ধতা) ইত্যাদি।

যাকাতের পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

حصة مقدرة، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، يصرف في جهات مخصوصة.

অর্থাৎ নির্ধারিত সম্পদ (নিসাব পরিমাণ) থেকে নির্দিষ্ট অংশ উপযুক্ত সময়ে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।[৯০]

২. যাকাতের হুকুম :

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পূরণকারী প্রত্যেক মুসলিমের ওপর যাকাত দেওয়া ফরয।[৯১]

৩. যাকাত আবশ্যক হওয়ার শর্তসমূহ :

ক. যাকাতের প্রথম শর্ত মুসলিম হওয়া। কেননা এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

'তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় কর যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।'[৯২] এ আয়াতের নির্দেশ মুসলিমদের জন্য, অমুসলিমদের জন্য নয়।

খ. বালেগ হওয়া। শরী'আহ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই যাকাত আদায়ের জন্য বালেগ হওয়া ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। অবশ্য বিশুদ্ধ মতে শিশুর যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তো তা থেকে যাকাত প্রদান করা তার ওলীর ওপর আবশ্যক।

গ. নিসাবের মালিক হওয়া। অর্থাৎ নিসাবের পরিমাণ পূর্ণ করে তার ওপর যাকাত দিতে হবে।

ঘ. নিসাব জীবনযাত্রা অপরিহার্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া।

ঙ. নিসাব পরিমাণ মালের এক বছর পূর্ণ হতে হবে। জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের স্থায়ী মালিকানার অধিকারী হওয়া।[৯৩]

৪. যাকাত, সাদাকাহ ও করের মধ্যকার পার্থক্য :

আমরা অনেক সময় যাকাত, কর ও সাদাকাহ একই ভেবে থাকি কিন্তু যাকাত ও সাদাকাহ এর মাঝে একটু

---

*দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৯০] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, খণ্ড:২, যাকাত অধ্যায়, পৃষ্ঠা: ০৫

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ, ০৫

[৯২] সূরা আত্-তাওবা আয়াত : ১০৩

[৯৩] ইসলামের যাকাত বিধান, (১ম খণ্ড) পৃ. ৪৬৪।

পার্থক্য আছে। কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দিলেই ইসলাম তাকে যাবতীয় সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলে মনে করে না; বরং সম্পদশালীদের জন্য জাতীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সম্পদ ব্যয়ের অন্য একটি দায়িত্ব মুমিনদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে, যাকে পরিভাষায় সাদাকাহ বলা হয়। আর সরকারকে নির্দিষ্ট বাৎসরিক আয়ের উপর কর প্রদান করতে হয়। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে এই তিনটি পার্থক্য উপস্থাপন করা হল।[৯৪]

ক্র.	যাকাত	কর	সাদাকাহ
১	যাকাত আল্লাহর নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ	সরকার আরোপিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ	আল্লাহ নির্দেশিত ঐচ্ছিক প্রদেয় অর্থ
২	নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বে সঞ্চিত সম্পদের ওপর আরোপি লেভী	আয়ের ওপর লেভী	আদৌ সে রকম নয়
৩	প্রদান করতে ২.৫% সম্পদ বা সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন	প্রদান করতে অর্থের প্রয়োজন	আবশ্যিকভাবে অর্থের প্রয়োজন নেই। সম্পদ ও আচরণও হতে পারে।
৪	আল-কুরআনে নির্দেশিত খাতেই ব্যয় করতে হবে	আদায়কৃত অর্থ সরকার যে কোনো কাজে ব্যয় করতে পারে	সুনির্দিষ্ট কোনো খাতের উল্লেখ নেই, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে
৫	সুনির্দিষ্ট নিসাব উল্লেখ রয়েছে যার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না	প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম সীমা পরিবর্তন হয়। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কোনো সীমা নেই।	কোনো রকম সুনির্দিষ্ট সীমা নেই

এছাড়াও আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে এ তিনটির মধ্যে।

৫. যে সকল মালের যাকাত ফরয :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তবে সকল সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করেননি। বরং পাঁচ প্রকার মালের যাকাত আদায় করার নির্দেশ এসেছে। যা নিম্নরূপ-

(৫. ১) بهيمة الأنعام তথা গৃহপালিত পশু : কারো নিকট গৃহপালিত পশু নিছাব পরিমাণ থাকলে তার ওপর যাকাত আদায় করা ফরয। আর তা হল, (ক) উট, (খ) গরু ও (ঘ) ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

'প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মারতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায়।[৯৫]

(৫. ২) النقدان তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য : কারো নিকট নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার ওপর যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ﴾

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে

[৯৪] *অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকাত ব্যবস্থাপনার সুফল পৃ. ১৪*

[৯৫] *সহীহ বুখারী হা : ১৪৬০, সহীহ মুসলিম হা : ৯৯০*

এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটা তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে। সুতরাং তোমরা যা সঞ্চয় করেছিলে তা আস্বাদন কর।[৯৬]

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

আবু হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'।[৯৭]

(৫. ৩) عروض التجارة তথা ব্যবসায়িক মাল : যে সকল মাল লাভের আশায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সে সকল মালের যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত'।[৯৮]

অত্র আয়াতে বর্ণিত مَا كَسَبْتُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যা উপার্জন কর' দ্বারা ব্যবসায়িক মালকে বুঝানো হয়েছে।

(৫. ৪) الحبوب والثمار তথা শস্য ও ফল : অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল গুদামজাত করা যায় এবং ওযনে বিক্রি হয় সে সকল শস্য ও ফলের যাকাত ফরয। যেমন- গম, যব, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।[৯৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'।

(৫. ৫) المعادن والركاز তথা খনিজ ও মাটির ভেতরে লুক্কায়িত সম্পদ : المعادن হল খনিজ সম্পদ, যা

[৯৬] *সূরা আত্-তওবা আয়াত : ৩৪-৩৫*
[৯৭] *সহীহ মুসলিম হা : ৯৮৭*
[৯৮] *সূরা বাকারা আয়াত : ২৬৭*
[৯৯] *সূরা আন'আম আয়াত : ১৪১*

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদি। আর الـركاز হল পূর্ববর্তী যুগের মানুষের রাখা সম্পদ, যা মানুষ মাটির ভেতরে পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূম হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।[১০০]

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ভূমি হতে উৎপাদন বলতে শস্য, খনিজ সম্পদ ও মানুষের লুকিয়ে রাখা সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত। কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খণি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে (মানুষের লুক্কায়িত সম্পদ) এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

৬. যাকাত বিতরণের খাতসমূহ :

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে আট শ্রেণীর লোককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাদের মধ্যে যাকাত বন্টন করে দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"এ সাদাকাগুলো তো আসলে ফকীর-মিসকীনদের জন্য আর যারা সাদাকা সংক্রান্ত কজে নিযুক্ত এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য। তাছাড়া দাসমুক্ত করার, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার, আল্লাহর পাথে এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন। তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ"।[১০১]

এ আয়াতে যাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নে তাদের বিবরণ দেওয়া হলো :

৬. ১. (আল-ফুকারা) দরিদ্র জনগণ : ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের জীবিকার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী। কোনো শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে অথবা কোনো সাময়িক কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ে সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬. ২. (আল-মাসাকীন) অভাবী : বাংলাদেশে উল্লিখিত ফুকারাউ মাসাকীনকে এক যোগে ফকীর মিসকিন বলা হয়। দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণির লোক তারাই যাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না। তাদের নিসাব পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বা ধন-সম্পদ তো দূরে থাক, প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, কাজের সরঞ্জাম, গবাদিপশু ইত্যাদির অভাব প্রকট। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সকলেই যাকাত পাওয়ার যোগ্য বা দাবিদার। ইসলামী সাহিত্যে এ শব্দদ্বয়ের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে।

৬. ৩. যাকাত বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী : এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সুতরাং তাদের বেতন এই উৎস থেকেই দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, রাসূল যাকাতের ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়ে যাকাতের অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী ও গবাদিপশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য আট শ্রেণির লোক নিযুক্ত ছিল। এরা হলো :

ক. সায়ী = গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক

খ. কাতিব = করণিক

[১০০] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৬৭*

[১০১] *সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০*

গ. ক্বাসেম = বণ্টনকারী

ঘ. আশির = যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী

ঙ. আরিফ = যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী

চ. হাসিব = হিসাব রক্ষক

ছ. হাফিয = যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক

জ. কাইয়াল = যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণকারী ও ওজনকারী।

৬. ৪. যাদের মন জয় করা প্রয়োজন : মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জন্য যে বিধান রয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে।

৬. ৫. দাসমুক্ত করার জন্য।

৬. ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ আদায় : ঋণগ্রস্ত তারাই যারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ করে কিন্তু তা পরিশোধ করতে পারে না। এদের ঋণ পরিশোধের জন্যও যাকাতের অর্থ ব্যয়িত হতে পারে।

৬. ৭. আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝিয়েছেন।

৬. ৮. মুসাফিরদের জন্য : যাকাতের অর্থ তাদেরকেও দেওয়া যাবে যারা মুসাফির।[১০২]

যেহেতু যাকাত সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে সহায়ক তাই যাকাত বন্টনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল প্রতি বছর কয়েকজনের যাকাত একত্র করে একজনকে স্বাবলম্বী করার নিমিত্তে তার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম প্রস্তুত করে দেওয়া। অধিকাংশ আলেম এমন পদ্ধতি পছন্দ করেছেন।

৭. যাকাত অস্বীকারকারীর হুকুম :

সকল আলেম একমত যে, যাকাতের আবশ্যকতাকে অস্বীকারকারী কাফের এবং কুরআন ও সুন্নাহকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী।

[১০২] *প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৯*

সম্পদ গচ্ছিতকারীর জন্য কুরআনে কঠিনভাবে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ﴾

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।[১০৩]

হাদীসে এসেছে যাকাত ত্যাগকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ النَّارِ-

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যাকাত ত্যাগকারী ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১০৪]

অতএব যাকাত প্রদান করা যেমন ফরয তেমনি যাকাতের ফরযিয়াত অস্বীকার করা বা সাহেবুল নিসাব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হে পাঠকবৃন্দ!

আমাদের মাঝে রমাযান সমাগত। এই মহিমান্বিত মাসে যাকাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে তা আদায় করার সামর্থ হলে যথাযথ যাকাত আদায় করে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভকে সমাজে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। ❑❑

[১০৩] *সূরা আত-তাওবাহ আয়াত : ৩৪-৩৫*
[১০৪] *সহীহ তারগীব হা : ৭৬২; সহীহুল জামে' হা : ৫৮০৭*

বিদ'আত চেনার ২৩টি মূলনীতি

মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-জীযানী ★

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব★

[প্রথম কিস্তি]

প্রধান তিনটি মূলনীতিকে সামনে রেখে মোট ২৩টি কায়েদার সাহায্যে বিদ'আতকে চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রথম মূলনীতিতে মোট ১০টি কায়েদার সন্নিবেশ ঘটেছে, যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রথম মূলনীতি : শরীয়তে বর্ণিত হয়নি এমন প্রক্রিয়ায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।

মূলনীতির ব্যখ্যা : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে: ১. ইবাদাতের মূল এবং ২. তার পদ্ধতি প্রমাণিত হওয়া।

ইবাদাতের মূল প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ শারয়ী দলীলের ওপর নির্ভরশীল। তবে নিম্নোক্ত উপায়ে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। যেমন:

◈ কোনো মিথ্যা হাদীস কিংবা দলীলের অনুপযুক্ত কোনো ক্বওল বা বক্তব্য ইবাদাতের ভিত্তি হওয়া

◈ অথবা ইবাদাতটি নাবী ﷺ-এর আস-সুন্নাতুত তারকিয়্যাহ [ব্যাখ্যা আসছে] বা সালাফদের আমল কিংবা শারয়ী মূলনীতির বিপরীত হওয়া আর ইবাদাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই মূলগত দিকে থেকে এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে শরীয়ত সমর্থিত হতে হবে। তবে এই পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ব্যত্যয় ঘটে থাকে, যেমন :

◈ ইবাদাত মূলগত দিক থেকে শারীয়তসম্মত না হওয়া

◈ অথবা কোনো পাপ কাজ করা [এ দুটি মূল]

◈ অথবা মূলগত দিক থেকে শরীয়তসম্মত হলেও পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আসা; সেটা হতে পারে মুকাইয়্যাদ ইবাদাতকে মুতলাক করা কিংবা মুতলাক ইবাদাতকে মুকাইয়্যাদ করার মাধ্যমে।

কায়েদা ০১. রাসূল ﷺ-এর নামে বর্ণিত মিথ্যা হাদীস ভিত্তিক সকল ইবাদাত বিদ'আত।[১০৫]

উদাহরণ :

◈ বিভিন্ন সূরার ফযীলত সংক্রান্ত বানোয়াট হাদীস।

◈ সলাতুর রাগায়েব বা রজব মাসের প্রথম শুক্রবার রাত্রে মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে যে সলাত আদায় করা হয়।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এই কায়েদাটি শরীয়তের একটি বড়ো মূলনীতি থেকে উৎসারিত, আর তা হলো :

'ইবাদাতের মূল হলো তাওকীফ বা স্থগিত'

অর্থাৎ, শারয়ী আহকাম কোনোভাবেই কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া অন্য কোনোভাবে প্রমাণিত হবে না। সুতরাং, রাসূল ﷺ-এর নামে বানোয়াট হাদীসগুলো আদতে সুন্নাহ হিসেবে ধর্তব্য নয়। এগুলো শরীয়ত সমর্থিত না হওয়ার কারণে এগুলোকে ভিত্তি করে আমল করা বিদ'আত।

কায়েদা ০২. কোনো একক রায় ও প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে যে ইবাদাত করা হয় তা বিদ'আত।[১০৬]

উদাহরণ:

◈ সূফীবাদের অসংখ্য আহকামের ভিত্তি হলো কাশফ, দর্শন ও বিভিন্ন অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলি। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই তারা হালাল-হারামের বিধান দিয়ে আসছে।[১০৭]

◈ 'আল্লাহ আল্লাহ' বলে [আল্লাহ শব্দের সাথে কোনোপ্রকার বিশেষণ যুক্ত না করে] অথবা সর্বনাম 'হু হু' ব্যবহার করে বিদাআতী যিকর করা এই দাবিতে যে, পূর্ববর্তী প্রজন্মের কেউ কেউ না কী এমনটি করার আদেশ করে গিয়েছেন।[১০৮]

◈ ফেরেশতা, নবী-রাসূল এবং মৃত বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের কাছে দু'আ করা, সাহায্য চাওয়া।[১০৯]

কায়েদার ব্যাখ্যা : এই কায়েদাটিতে বিদ'আতীদের একটি উল্লেখযোগ্য আলামতের কথা বলা হয়েছে, আর সেটা

★ *উসতায, উসুলুল ফিকহ, জামিয়া ইসলামীয়া মাদীনা*

★ *অধ্যয়নরত, শারীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা।*

[১০৫] *আল-ই'তিসাম, ইমাম শাতিবী (রহিঃ) ১/২২৪-২৩১*
[১০৬] *আল-ই'তিসাম, শাতিবী, ১/২১২-২১৯*
[১০৭] *আল-ই'তিসাম, শাতিবী, ১/২১২*
[১০৮] *মাজমূউল ফাতাওয়া: ১০/৩৯৬*
[১০৯] *ঐ: ১/১৫৯*

হলো, 'সকল বিদআতী তার বিদ'আতের স্বপক্ষে শারয়ী দলীল উপস্থাপন করে; চাই সেটা সহীহ হোক কিংবা যঈফ'। কোনো বিদ'আতী নিজেকে শরীয়তের গণ্ডির বাহিরে গণ্য করতে নারাজ।

মোটকথা, কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত ইবাদাত মাত্রই বিদ'আত। এমনকি যদি কোনো বিদ'আতী কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোনো দলীলকে উপযুক্ত মনে করে দলীল দিয়েও থাকে, তবে সেটা আদতে বিজ্ঞজনদের কাছে মাকড়সার ঘরের মতোই ভঙ্গুর।

আত-ত্বরতুশী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোনো কাজ সমাজে ছড়িয়ে পড়লেই সেটাকে জায়েয বলা যাবে না। তেমনিভাবে কোনো কাজ অজানা বা গোপন থাকলেও সেটাকে নিষিদ্ধ বলা যাবে না।[১১০]

তাকলীদ বিষয়ে কিছু কথা : কিছু তাকলীদ আছে যেটাকে গর্হিত তাকলীদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন বাপ-দাদার তাকলীদ করা, অযোগ্য ব্যক্তির তাকলীদ করা, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তাকলীদ করা, সময়-সুযোগ থাকার পরও অপ্রয়োজনে ইজতিহাদে সক্ষম এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা, এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা যার কথা কুরান-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

কিন্তু যদি সাধারণ জনগণের মাঝে কেউ কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ করে তবে সেটা গর্হিত তাকলীদের আওতাভুক্ত হবে না। বরং সেটা একটি ব্যাপক আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে, আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) বলেছেন: 'তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি না জেনে থাকো'।[১১১] আর এ ধরনের তাকলীদ জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে মুকাল্লিদকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে, মুজতাহিদ ব্যক্তিটি আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের একজন প্রচারক মাত্র আর নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই নির্দিষ্ট।

সুতরাং, একজন সাধারণ লোক যখন সত্যটা জানতে পারবে এবং ভিন্ন মতটাই তার কাছে অধিক প্রণিধানযোগ্য হিসেবে সুস্পষ্ট হবে তখন তার জন্য তাকলীদ করা নিষেধ।[১১২]

কায়েদা ০৩. কোনো 'ইবাদাতের কারণ, আবশ্যকতা বর্তমান থাকা এবং প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ইবাদাতটি বর্জন করেন তবে সেই ইবাদাত করা বিদ'আত।[১১৩]

উদাহরণ :

◈ সলাতের শুরুতে মুখে নিয়্যাত করা

◈ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ব্যতীত আযান দেওয়া

◈ সাফা-মারওয়া সায়ী করার পর সলাত আদায় করা

কায়েদার ব্যাখ্যা : আস-সুন্নাহ আত-তারকিয়্যাহর সাথে এই কায়েদার সম্পৃক্ততা রয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক কোনো কাজ না করাকে আস-সুন্নাহ আত-তারকিয়্যাহ বলা হয়। এটা দু'ভাবে জানা যায়।[১১৪]

ক. কোনো সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যদি এভাবে বলে থাকেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুক অমুক কাজটি করেননি; যেমন হাদীসে এসেছে, 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযান ও ইকামাত ছাড়াই ঈদের সলাত আদায় করেছেন'।

খ. সাহাবীগণ কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন কোনো কাজের কথা বর্ণিত না হওয়া, যে কাজটি যদি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করতেন তবে তাদের (সাহাবীদের) সকলের অথবা অধিকাংশের অথবা কোনো একজনের মাঝে সেটা বর্ণনা করার আগ্রহ দেখা যেত। কিন্তু আদৌ এমন কিছু বর্ণিত হয়নি। যেমন:

◈ সলাতের শুরুতে মৌখিক নিয়্যাত করা

◈ সকাল-বিকাল ফরয সলাতের পর মুসল্লিদের দিকে ঘুরে দুআ করা এবং আমীন বলা

মোটকথা, একজন মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা করেছেন এবং যা করেননি, উভয়টিই সমানভাবে অনুসরণ করা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কাজ না করার বিষয়টি তিনটি অবস্থা থেকে খালি নয়;

ক. হয়ত কাজটি করার কোনো প্রয়োজন পড়েনি; যেমন যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর বিষয়টি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাজটি করেননি। কিন্তু এই 'না করা'-টি সুন্নাত নয়। [অর্থাৎ, তাদের সাথে বরং যুদ্ধ ঘোষণা করা সুন্নাহ]

---

[১১০] *আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদা', আত-ত্বরতুশী : ৭১*
[১১১] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ৪৩*
[১১২] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ : ২২/২৪৯*
[১১৩] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ : ২৬/১৭২*
[১১৪] *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ: ৪/২৬৪*

খ. অথবা হয়ত কাজটি করার পরিস্থিতি তৈরি হলেও প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে তিনি ﷺ কাজটি করেননি। যেমন, নাবী ﷺ রমাদান মাসের কিছুদিন জামা'আত করে কিয়াম করেছিলেন, কিন্তু উম্মতের ওপর ওয়াজিব হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় পরবর্তীতে এটা আর করেননি। এই 'না করা'-টিও সুন্নাত নয়।

গ. অথবা হয়ত কাজটি করার পরিস্থিতি ছিল এবং কোনো প্রতিবন্ধকতাও ছিল না; এই 'না করা'-টি সুন্নাহ। যেমন, নাবী ﷺ তারাবীহর সলাতের জন্য আযান দেননি।

কায়েদা ০৪. সালফে সালেহীন (সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন) যে ইবাদাত নিজে করেননি অথবা নিজ গ্রন্থে স্থান দেননি অথবা সঙ্কলন করেননি অথবা ইলমী বৈঠকে উপস্থাপন করেননি; এই 'ইবাদতটি তখনই বিদ'আত হবে যদি ইবাদতটি করার চাহিদা থাকে এবং প্রতিবন্ধকতা না থাকে।[১১৫]

উদাহরণ :

◈ সলাতুর রাগায়েব; আল্লামা ইয বিন আব্দুস সালাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'সলাতুর রাগায়েব বিদ'আত হওয়ার অন্যতম একটি দলীল হলো, সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন কিংবা শরীয়ত নিয়ে যারাই কোনোকিছু সংকলন করেছেন কারো থেকেই এই সলাতের প্রামাণিকতা বর্ণিত হয়নি। তারা বিষয়টি নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি, এমনকি ইলমী বৈঠকেও উল্লেখ করেননি। অথচ তাদের মাঝে মানুষকে শেখানোর যে চরম উৎসাহ ছিল তা বর্ণনাতীত।

◈ কোনো দিবস উপলক্ষ্যে মাহফিল ও উৎসব অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। কারণ, উৎসব শরীয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং, এক্ষেত্রে ইত্তিবা আবশ্যক, ইবতিদা নয়।

কায়েদার ব্যাখ্যা : উল্লিখিত কায়েদার উৎস :

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, **'সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যেই** ইবাদাত করেননি, তোমরা তা করো না। কারণ, প্রথম প্রজন্ম পরবর্তী উম্মতের জন্য কোনো মাক্বাল (কথা বলার সুযোগ) রাখেননি। তোমরা সেই পূর্ববর্তীদের পথের অনুসরণ করো।[১১৬]

মালিক বিন আনাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম যা দিয়ে সফল হয়েছে তা অবলম্বন করা ব্যতীত উম্মতের শেষ প্রজন্ম সফল হতে পারবে না।'[১১৭]

এই কায়েদাটির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কায়েদার সকল নিয়ম-কানুন, শর্তাবলী প্রযোজ্য। কারণ দুটোর সূত্র মূলত একই।

এক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি (জানা উচিত) : এই উম্মতের ক্ষেত্রে যদি কোনো ইবাদাত করার যৌক্তিকতা দেখা দেয় তবে সেই ইবাদাতটি নাবী ﷺ-এর পক্ষে সম্পাদন করা আরো বেশি যৌক্তিক। কারণ, তিনি উম্মতের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী।

সালফে সালেহীনদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'নাবী ﷺ একটি কাজ করেননি, কিন্তু যদি সেটা শরীয়তে থাকতো তবে তিনি হয়ত করতেন অথবা অনুমতি দিতেন এবং তার পরবর্তী খলীফা সাহাবীগণ করতেন; এ ধরণের কাজ করা বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা। এক্ষেত্রে ক্বিয়াস করাও নিষিদ্ধ।[১১৮]

কায়েদা ০৫. শরীয়তের মূলনীতি ও মাকসাদ-বিরোধী প্রতিটি 'ইবাদাত বিদ'আত।[১১৯]

উদাহরণ:

◈ কেউ কেউ মনে করে যে, যিকর-আযকার, দুআ ইত্যাদির ভিত্তি হলো ইলমুল হুরুফ। (ইলমুল হলো আরবি সংখ্যাতত্ত্বের একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আরবি অক্ষরের জন্য নির্ধারিত সংখ্যাসূচক মান দ্বারা কুরআনের শব্দাবলীর মান নির্ণয় করা হয়। এর মাধ্যমে সাধারণত শব্দের লুকানো বার্তা উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়।[১২০]

◈ দুই ঈদের সলাতের জন্য আযান দেওয়া। নফল সলাতের জন্য কোনো আযানের বিধান নেই। আযান শুধুমাত্র ফরয সলাতের জন্য নির্দিষ্ট।

◈ সলাতুর রাগায়েব : এই সলাত কয়েকভাবে শরীয়তের মূলনীতির বিপরীত,

ক. নাবী ﷺ জুমু'আর রাত্রিকে ক্বিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

---

[১১৫] *আল-বায়েস আলা ইনকারিল বিদা ওয়াল হাওয়াদিস, আবূ শামাহ আল-মাকদিসী: ৪৭*

[১১৬] *সহীহ বুখারীতে অনুরূপ : ৭২৮২*

[১১৭] *ইক্বতিদাউ আস-সিরাতিল মুসতাকীম, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ২/২৪৩*

[১১৮] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ২৬/১৭২*

[১১৯] *আল-ইতিসাম, শাত্বিবী: ১/৪৯৬*

[১২০] *সূত্র: উইকিপিডিয়া।*

খ. সলাতুর রাগায়েবের পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে ব্যক্তির সলাতে স্থিরতা ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, একাধিক তাসবীহ, প্রতি রাকাতে সূরা কদর ও ইখলাসের সংখ্যা গুনতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই হাতের আঙ্গুলের সাহায্য নিতে হয়।

এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের মাকসাদ বা উদ্দেশ্য জানা এবং মূলনীতি আয়ত্ত করার গুরুত্ব প্রতীয়মান হচ্ছে।

কায়েদা ০৬. শরীয়তে উল্লেখ নেই এমন সামাজিক রীতিনীতি কিংবা মুআমালাত, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয়, সেগুলো বিদআত।[১২১]

উদাহরণ :

◈ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে পশমের কাপড় পরিধান করা।[১২২]

◈ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক নিরব থাকা অথবা রুটি, গোশত খাওয়া কিংবা পানি পান করা থেকে বিরত থাকা অথবা সারাক্ষণ সূর্যের নিচে থাকা এবং ছায়া গ্রহণ না করা।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এই কায়েদাটি ঐ সকল সামাজিক রীতিনীতি ও মু'আমালাতের সাথে নির্দিষ্ট যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাওয়া হয়। এখানে দু'ভাবে বিদ'আত এসে থাকে; ১. মূলগত এবং ২. পদ্ধতিগত।

এ কারণে এই কায়েদার অধীনে আলোচিত সকল উদাহরণই বিদ'আহ হাকীকী বা নিরেট বিদ'আতের শ্রেণীভুক্ত, যেগুলোর জুমলাতান ওয়া তাফসীলান (সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে) কোনো ভিত্তি কিংবা দলীল নেই।

তবে এই সামাজিক রীতিনীতি ও মু'আমালাত-গুলোই আবার ইবাদাতে পরিণত হয়, যখন এগুলোর সাথে বিশুদ্ধ নিয়্যাত অথবা সৎ কাজ করার নিয়্যাত যুক্ত হয়। তখন এগুলোকে বিদ'আত বলা হবে না। যেমন একটি হাদীস,

"আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তুমি যা কিছুই খরচ কর তার ওপর তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি, সে লোক মাটির বদৌলতেও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে।"[১২৩]

ইবনে রজব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'কেউ যদি এমন কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায় যা আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেননি তবে তার আমল বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত।[১২৪]

কায়েদা ০৭. আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) নিষেধ করেছেন এমন কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা বিদ'আত।[১২৫]

উদাহরণ :

◈ গান শোনা অথবা নাচানাচি করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।[১২৬]

◈ কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এই উদাহরণটিতে বিদআতের তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়।

কায়েদার ব্যখ্যা : পূর্বের কায়েদাটির ন্যায় এটাও মূলগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে বিদআত। সুতরাং, এটাও বিদাআহ হাকীকী বা নিরেট বিদআত। কিন্তু বিগত কায়েদাটি সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে, আর এটি নিষিদ্ধ কার্যাবলী ও পাপ কাজের ক্ষেত্রে।

ইমাম শাতিবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'প্রত্যেক নিষিদ্ধ ইবাদাত আসলে ইবাদাত নয়। যদি ইবাদাত হতোই তবে আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) নিষেধ করতেন না। এরপরও যদি কেউ এগুলো করে তবে সে নিষিদ্ধ কাজ করল। আর যদি কেউ এগুলোকে ইবাদাত মনে করেই করে বসে তবে সে বিদাআতী।[১২৭]

কায়েদা ০৮. সুনির্ধারিত পদ্ধতি সম্বলিত ইবাদাতের পদ্ধতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসা বিদআত :

এই কায়েদার অধীনে কিছু পদ্ধতি :

১. সময়ের পরিবর্তন; যেমন যুল-হিজ্জাহর প্রথম দিনে কুরবানি করা।

---

[১২১] *আল-ইতিসাম, শাত্বিবী*
[১২২] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ : ১১/৫৫৫*
[১২৩] *সহীহ বুখারী হা : ১৪০৯*
[১২৪] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী: ১/১৭৮*
[১২৫] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী: ১/১৭৮*
[১২৬] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ : ৩/৪২৭*
[১২৭] *আল-ইতসাম: ১/৫১২*

২. স্থানের পরিবর্তন; যেমন মসজিদ ব্যতীত ভিন্ন জায়গায় ইতিকাফ করা।

৩. জাতগত পরিবর্তন; যেমন ঘোড়া দিয়ে কুরবানি করা

৪. পরিমাণ পরিবর্তন; যেমন ষষ্ঠ ওয়াক্ত সলাত বৃদ্ধি করা

৫. পদ্ধতি পরিবর্তন; যেমন অজুর ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন করা

কায়েদার ব্যাখ্যা : একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে ভিত্তি করে এই কায়েদাটি দাঁড়িয়ে আছে; আর তা হলো-

'ইবাদাতের ক্ষেত্রে শরীয়তের উদ্দেশ্য দুটি বিষয়ের অনুসরণ ব্যতীত বাস্তবায়িত হবে না:

ক. বিশুদ্ধ দলীলের মাধ্যমে ইবাদাতের ভিত্তি/মূল প্রমাণিত হওয়া

খ. মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত) অথবা মুতলাক (শর্তবিহীন/সাধারণ), যেকোনভাবে ইবাদাতের পদ্ধতি প্রমাণিত হওয়া।

কায়েদা ০৯. যে সকল ইবাদাত কোনো আম (ব্যাপক) দলীল দ্বারা প্রমাণিত, এমন ইবাদাতকে কোনো নির্দিষ্ট সময় অথবা স্থানের সাথে বিনা দলীলে শরীয়তের উদ্দেশ্য মনে করে শর্তযুক্ত করা বিদআত।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এই কায়েদাটি ঐ সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো মৌলিকভাবে প্রমাণিত, কিন্তু পদ্ধতিতে নতুনত্ব নিয়ে আসা হয়েছে।

উদাহরণ : কোনো মর্যাদাপূর্ণ দিনকে নির্দিষ্ট ইবাদাত দিয়ে বিশেষিত করা; অর্থাৎ, অমুক দিনে এতো রাকাত সলাত পড়া বা সদাকাহ করা। অথবা নির্দিষ্ট কোনো রাতকে নির্ধারিত রাকাত সলাত কিংবা কুরআন খতম করে বিশেষায়িত করা।

কায়েদা ১০. ইবাদাতের নির্ধারিত পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাড়াবাড়ি করা এবং ইবাদাত পালনে কড়াকড়ি করা।[১২৮]

উদাহরণ :

◈ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাত্রে না ঘুমিয়ে সারা রাত ধরে কিয়াম করা।

◈ সারা বছর টানা রোযা রাখা।

◈ বিবাহ না করা

◈ হজ্বের সময় জামরাতে বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষেপ করা এই যুক্তিতে যে, এগুলো তো কংকর থেকেও ছোটো।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এই কায়েদাটির ভিত্তি হলো নিম্নে বর্ণিত হাদীস, আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল রাসূল ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূল ﷺ-এর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হল, তখন তারা এ ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা রাসূল ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তার আগে ও পরের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব কখনও শাদী করব না।

এরপর রাসূল ﷺ তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।[১২৯]

উপরের হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে :

ক. ইবাদাতের ক্ষেত্রে; যার ফলে ব্যক্তি এমন ইবাদাতকে ওয়াজিব ও মুসতাহাবের কাতারে ফেলে দেয় যা আসলে ওয়াজিব কিংবা মুসতাহাব নয়।

খ. তায়্যিবাতের (বৈধ হালাল বস্তুর/বিষয়ের) ক্ষেত্রে; যার ফলে ব্যক্তি এমন কাজকে হারাম ও মাকরূহের কাতারে ফেলে দেয় যা আসলে মাকরূহ কিংবা হারাম নয়। (সংক্ষেপিত) *(চলবে ইনশা আল্লাহ)* ❑❑

[১২৮] *আহকামুল জানায়েয : ২৪২*

[১২৯] *সহীহ বুখারী হা : ৫০৬৩*

যেমন ছিল সালাফদের রমাযান

মাযহারুল ইসলাম ❄

ভূমিকা : রমযান কল্যাণের মাস। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত যাবতীয় কল্যাণের সমাহার নিয়ে বছর ঘুরে আমাদের সামনে রমাযান উপস্থিত হয়। রহমত, বরকত আর মাগফেরাতের সামষ্টিক রূপ রমাযান। সত্যিকার অর্থে ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত যে এ মহান মাস পেল অথচ সিয়াম রাখতে পারলো না। এই সুবর্ণ বর্ণাঢ্য আয়োজনে যেখানে ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত একাকার হয়। যেই ইবাদতের একেকটি মহামূল্যবান, ফলাফল কাঙ্ক্ষিত জান্নাত। সিয়াম এমন একটি ইবাদত যেই ইবাদতের সওয়াব আনলিমিটেড ও পুরস্কারও মহান রবের হাত থেকে পাওয়া যায়। সুবহান আল্লাহ! কতই না সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তির জীবন যে এমন প্রভূত কল্যাণের মালিক হতে পারে। তাই তো আমরা দেখি সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্বসূরী সালফে সালেহীন রমাযানের সিয়ামকে পাওয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই দোয়া ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, দারস-তাদরীস, দায়বদ্ধতা, সফর ছাড়াও সকল কিছু থেকে মুক্ত থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতেন। মূলতঃ বক্ষমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য - উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের রমাযানের সিয়াম সাধনা, পরিশ্রম, লৌকিকতাহীন ইবাদত করে সিয়ামের যথার্থ হক আদায় করে উভয় জীবনে সফলতার পথে চলা। আমরাও তাই তাঁদের মত আলোকোজ্জ্বল অনুপ্রেরণার জীবন গড়তে তাঁদের ইবাদতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জান্নাত কামনা করতে চাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন আমীন।

◈ যেভাবে সাহাবী ও সালাফগণ রমাযানের পস্তুতি গ্রহণ করতেন -

সাহাবী ও সালাফগণ রমাযান আসার পূর্বে নানা রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রমাযানকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন, রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের পাবন্দ হওয়ার জন্য তারা সদা উদগ্রীব ছিলেন। রমাযানের এই ইবাদতের মৌসুম উপলক্ষে তাঁদের চেহারায় আনন্দ পরিলক্ষিত হত ছাপ। সদা হাস্যোজ্জ্বল, পরিস্ফুটিত চেহারা জ্বলজ্বল করতো। তাঁদের রমাযানের প্রস্তুতি হতো দোয়া করার মাধ্যমে। কেননা রমাযান মাসে যাবতীয় কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করা হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়। যেই মাস হলো কুরআনের মাস। সেই কারণে তাঁরা আনন্দে আবেগাপ্লুত হত। আনন্দ, খুশীর বহিঃপ্রকাশ করত। তাঁরা রমাযানের আগমনে যাবতীয় দায়বদ্ধতা, কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকার প্রস্তুতি নিতো। উদ্দেশ্য যেন রমাযান মাসের ইবাদত হাতছাড়া না হয়। যথাযথভাবে প্রত্যেক সময়কে মূল্যায়ন করতে তাঁরা বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করতেন।

কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত, তাঁরা আল্লাহর কাছে ৬ মাস দোয়া করতেন এই মর্মে যে, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের রমাযানে পৌঁছান (তথা - তাঁরা সিয়াম রাখতে পারেন)। অতঃপর রমাযান পরবর্তী ৫ মাস তাঁরা দোয়া করতেন আল্লাহ যেন তাদের সিয়াম আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাদের রমাযানে উপনীত করে দ্বীন ও শারীরিক কল্যাণের ওপর এবং তাঁরা আল্লাহকে ডাকতেন যেন তিনি তাঁদেরকে তাঁর আনুগত্যের ওপর সাহায্য করেন। তাঁরা দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলসমূহ কবুল করেন।[১৩০]

রমাযানের সিয়াম সাথে অনান্য ইবাদত পালনে কোনোরকম ঘাটতির সম্ভাবনা এড়াতে সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ শা'বান মাসে বেশি করে সিয়াম রাখার অনুশীলন করতেন।

রমাযান মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে। এজন্য বলা হয় রমাযান কুরআনের মাস। কুরআন তেলাওয়াত, উপলব্ধি, অনুধাবন এবং তার বাস্তব চিত্র জীবনে ধারণ করার সুবর্ণ সুযোগ হলো রমাযান মাস। এজন্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ শা'বান মাসেই কুরআন তেলাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করতেন। সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন - মুসলিমদের কাছে যখন শা'বান মাস উপনীত হয় তখন তাঁরা কুরআনের মাসহাফের উপর উপুড় হয়ে পড়ত (লা'ত্বায়িফুল মা'য়ারেফ ইবনে রজব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কিতাব থেকে গৃহীত)।

❄ *অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

[১৩০] *লা'ত্বায়িফুল মা'আরেফ, ইবনে রজব হাম্বলী পৃষ্ঠা -১৪৮*

সালামা বিন কাহিল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন - শা'বান হলো কুরআন তেলাওয়াতের মাস। ক্বারীদের মাস।

রমাযান মাস প্রবেশ করলে তখন তিনি ইমাম মালেক বিন আনাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসের দারস ও আহলুল ঈলমের মজলিস থেকে সরে যেতেন । শুধুমাত্র কুরআন গ্রহণ করতেন তিলাওয়াতের জন্য।[১৩১]

রমাযান মাস আগমন করলে তিনি সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যাবতীয় ইবাদত পরিত্যাগ করে শুধু কুরআন গ্রহণ করতেন।[১৩২]

যেমন ছিল সালাফদের রমাযানের দৈনন্দিন

রমাযানের সিয়াম মানেই হলো আত্মসংযম, যাবতীয় অন্যায়, অশালীন, মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা। গীবত, তোহমত, সুদ, ঘুষ, মিথ্যাচার ছাড়াও সকল প্রকারের পাপ থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম তথা রোজা। যেহেতু সিয়াম মানুষকে বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার পাপের পথ থেকে নিষেধ করে তাই একজন রোজাদারের জীবন হয় পরিমার্জিত, সুসজ্জিত, সুংগঠিত। পাপের কোনো প্রকার গন্ধ তাঁর শরীরে পাওয়া যাবে না বলেই সিয়াম নিয়ে আসে বড় আত্মসংযমী শিক্ষা। প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ রমাযানের সিয়াম থাকা অবস্থায় কিভাবে দিনাতিপাত করতেন। তাদের চিত্র আর আমাদের জীবন যাত্রার চলমান চিত্রকে তুলনা করুন। দেখুন আমাদের কত করুণ অবস্থা! সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ রমাযান মাসে খেতেন হিসাব করে, কম খেতেন, কম ঘুমাতেন, কম কথা বলতেন, ঘোরাফেরা খুব কমই করতেন। সব সময় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। সকল ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁরা ইবাদতবিমুখ চিন্তা-চেতনায় মশগুল অবস্থা থেকে যথাযথ বিরত থাকতেন। তাঁরা পরস্পর সৎ কাজের প্রতিযোগিতা করতেন। প্রত্যেকে সময়ের মূল্যায়ন করতেন।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : সময় নষ্ট মৃত্যুর চেয়েও বেশি কঠিন। কেননা সময় নষ্ট আল্লাহ ও পরকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর মৃত্যু তোমাকে দুনিয়া ও তোমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে।[১৩৩]

সিয়াম শুধুই ভুখা থেকে দিন যাপনের নাম নয়। বরং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত এক ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচির নাম। সিয়াম যেমন রোজাদারের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে যা আল্লাহর আবশ্যকীয় হক, ঠিক তেমনি সিয়াম আরো শিক্ষা দেয় সিয়াম থাকা অবস্থায় কিভাবে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জিহ্বাকে হেফাজত করা যায়।

সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : যখন তুমি সিয়াম রাখবে তখন তুমি তোমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তির সিয়াম রাখো। তোমার জিহ্বাকে যাবতীয় মিথ্যাচার ও হারাম থেকে বিরত থাকার সিয়াম রাখো এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকো। তোমার ওপর আবশ্যক হলো- সিয়াম থাকা অবস্থায় নম্র, বিনয়ী, ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

খবরদার! সিয়ামের দিন আর অনান্য দিনসমূহ এক করিও না।[১৩৪]

সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ রমাযানের সিয়াম থাকা অবস্থায় গীবত, মিথ্যাচার, মূর্খতামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতেন যাতে করে সিয়ামের ওপর প্রভাব না পড়ে ।

কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত, গীবত সিয়ামকে ছিদ্র করে (নষ্ট করে) আর ইস্তিগফার তা জোড়াতালি দেয় (ঠিক করে)।[১৩৫]

ইবনুল মুনকাদির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন - রোজাদার ব্যক্তি যখন গীবত করে তখন সে সিয়ামকে ছিদ্র করে। আর যখন ইস্তিগফার করে তখন তা জোড়াতালি লাগে।[১৩৬]

তাঁরা সিয়াম থাকা অবস্থায় সালাত, সিয়ামের পাশাপাশি দান-সদকা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির আজকার, মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

◈ সিয়ামকে কেন ঢালস্বরূপ বলা হলো-

যুদ্ধের মাঠে যেমন বিরোধী দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় প্রতিপক্ষকে হেনস্তা, পরাজিত করার জন্য ঠিক এমন সঙ্কটময় যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের তরবারি, তীর, অস্ত্রশস্ত্র থেকে নিজেকে সুরক্ষা, হেফাজত রাখার জন্য যে

[১৩১] *লা ত্বায়িফুল মা'আরেফ ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ কিতাব থেকে গৃহীত*
[১৩২] *লা ত্বায়িফুল মা'আরেফ ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ কিতাব থেকে গৃহীত*
[১৩৩] *আল ফাওয়ায়েদ , ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী*
[১৩৪] *ইবনু আবী শায়বাহ্ - ৮৮৫২*
[১৩৫] *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী*
[১৩৬] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ইবনে রজব হাম্বলী*

বস্তু ব্যবহার করে সেনাবাহিনী তাঁকে ঢাল বলে। সিয়ামকে ঢাল বলা হয়েছে এজন্য যে- ঢাল যেমন ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে আঘাত, তীরসহ যাবতীয় অস্ত্র থেকে রক্ষা করে ঠিক তেমনি সিয়াম বান্দাকে যাবতীয় পাপাচার, অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করে দুনিয়ার জীবনে। মনে রাখবেন! যদি রোজা দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় পাপাচার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ হয় তাহলে সেই সিয়াম তার জন্য পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে। আর যদি দুনিয়ার জীবনে সিয়াম যাবতীয় পাপাচার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ না করে তাহলে পরকালেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে না। এজন্য সিয়ামকে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১৩৭]

◈ সালাফদের ক্বিয়ামুল লাইল -

-১. ইবনু মুনকাদির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : তিনটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার কোনো স্থায়ী স্বাদ নেই- ১. ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহ/তাহাজ্জুদ) ২. মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ ৩. জামাতের সাথে সালাত আদায়।

২. আবু সুলাইমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : খেল-তামাশায় মত্ত প্রেমিকদের চেয়ে ইবাদতগুজার ব্যক্তির রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকাতে রয়েছে অনেক স্বাদ, মিষ্টতা। যদি রাত না থাকত তাহলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছাই থাকতো না।

৩. একজন সালাফ বলেন : যদি রাজা-বাদশারা জানতো, আমরা রাতে কী নেয়ামত পাই তাহলে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করত।

৪. আলী বিন বাকার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : চল্লিশ বছর সূর্য উদিত ছাড়া আমাকে অন্য কিছু চিন্তাগ্রস্ত করেনি।

৫. ফুজাইল বিন ইয়াজ বলেন- যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমি আনন্দিত হই রাত্রির অন্ধকারে আমার রবের সান্নিধ্যে একাকিত্বের জন্য। আর যখন সূর্য উদিত হয় মানুষের সামনে তখন আমি চিন্তাগ্রস্থ হই।[১৩৮]

[১৩৭] *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম ইবনে রজব হাম্বলী*
[১৩৮] *ক্বিয়ামুল লাইল কিতাব থেকে গৃহীত, লেখক: ড. মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম সুলাইমান আর রুমী*

◈ সালাফদের ঈদ উদযাপন -

ইবনে রজব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন -

ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাক পরিধান করে বরং ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার আনুগত্য বৃদ্ধি করে।

ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাকের সাজসজ্জা ও গাড়ি বহর প্রদর্শন করে, বরং ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পাপকে মোচন করা হয়েছে।[১৩৯]

একদিন এক ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের দিন আমিরুল মুমিনিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে প্রবেশ করে তাঁর কাছে একটি শুকনো রুটি পান। লোকটি শুকনো রুটি দেখে বলে- হে আমীরুল মুমিনিন! আজকে ঈদের দিন অথচ শক্ত শুকনো রুটি! আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বলেন - আজকে ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার সিয়াম, ক্বিয়াম কবুল করা হয়েছে। ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং আমল কবুল করা হয়েছে। আজকে আমাদের জন্য ঈদ, আগামীকালও আমাদের জন্য ঈদ। প্রত্যেক এমন দিন যে দিনে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না সেই দিনেই আমাদের জন্য ঈদ।[১৪০]

সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কতিপয় সাথী বলেন - আমি ঈদের দিন তাঁর সাথে বের হয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন - আমরা এই দিন (ঈদের) সর্বপ্রথম শুরু করবো চোখ নিম্নগামী করার মাধ্যমে।[১৪১]

কতিপয় সালাফের মুখে হতাশা, দুশ্চিন্তার ছাপ প্রকাশ পায় ঈদের দিনে। ঈদের দিন আনন্দ, খুশির বদলে এমন মলিন চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করা হল- আজকের দিন হলো খুশির, আনন্দের। অতঃপর তিনি প্রতোত্তরে বলেন-তোমরা সত্য বলেছো। কিন্তু আমি এমন একজন বান্দা যে, আমার রব আমাকে আদেশ করেছে তাঁর জন্য এমন আমল করার অথচ আমি জানি না যে, তিনি আমার পক্ষ থেকে আমল করেছেন কিনা?[১৪২]

হাসান বছরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন - প্রত্যেক এমন দিন যে দিনে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না সেটাই হলো ঈদ।[১৪৩]

[১৩৯] *লা' ত্বায়িফুল মা' আরেফ ইবনে রজব হাম্বলী পৃষ্ঠা-২৭৭*
[১৪০] *মাওকেয়ুল মিম্বার থেকে গৃহীত, খুতবার বিষয়- ঈদুল আযহা আল মুবারক*
[১৪১] *আত্বতাবছিরাহ্, ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী, পৃষ্ঠা-১০৬*
[১৪২] *লা' ত্বায়িফুল মা' আরেফ ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ পৃষ্ঠা-২০৯*
[১৪৩] *লা' ত্বায়িফুল মা'আরেফ ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ পৃষ্ঠা -২৭৮*

◈ রমযান ও রমযান পরবর্তী সালাফদের কুরআন খতম-

মুসান্না বিন সাঈদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন - আমি এ মসজিদে (তথা বানী যাবিয়াহ্) পেয়েছি এমন অবস্থায় তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে রমাযানে সালাত আদায় করছে প্রত্যেক তিন দিনে কুরআন খতম করার মাধ্যমে (ছিয়াম, ফারাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কিতাব থেকে গৃহীত)।

প্রখ্যাত তাবেয়ী ক্বাতাদাহ রহঃ প্রত্যেক সাত দিনে কুরআন খতম করেন (ঐ)।

ইমাম লাইস হতে বর্ণিত, নিশ্চয় বেলাল আব্বাসী রমাযান মাসে ক্বিয়াম করতেন, তিনি তাদের সাথে কুরআনের এক চতুর্থাংশ পড়তেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করতেন (ঐ)।

সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রমাযান মাসে প্রত্যেক তিন দিনে কুরআন খতম করতেন।[১৪৪]

সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ দুইমাসে একবার কুরআন খতম দিতেন (আত-তিবইয়ান ফি আদাবি হামলাতিল কুরআন, ইমাম নভবী রহঃ কিতাব থেকে গৃহীত)। আর কেউ কেউ এক মাসে একবার কুরআন খতম দিতেন (ঐ)। আর কেউ কেউ ১০ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন (ঐ)। আর কেউ কেউ ৮ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন (ঐ)। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই ৭ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন (ঐ)। আর কেউ কেউ ৬ দিনে দিতেন। কেউ পাঁচ দিনে, কেউ চার দিনে (ঐ)। কেউ তিন দিনে, কেউ দুই দিনে আর কেউ দিনে রাতে একবার কুরআন খতম করতেন (ঐ)। কেউ কেউ দিনে একবার রাতে একবার কুরআন খতম দিতেন (ঐ)। আর কেউ তিন বার (ঐ)। আর কেউ দিনে চারবার রাতে চারবার মোট আটবার কুরআন খতম দিতেন (ঐ)।

◈ যারা দিনে রাতে একবার কুরআন খতম দিতেন তারা হল-উসমান বিন আফফান, তামীম দারী, সাঈদ বিন জুবাইর, মুজাহিদ শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ঐ)।

◈ যারা তিনবার খতম দিতেন তারা হলেন- সুলাইম বিন ঈতর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবু বকর বিন আবু দাউদ (ঐ)।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রত্যেক রমাযান মাসে দিনে একবার কুরআন খতম করতেন।[১৪৫]

যেহেতু রমাযান মাস কুরআনের মাস। বরকতপূর্ণ মাস এবং মাসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফযিলতপূর্ণ তাই তাঁরা এই সুবর্ণ সুযোগ লুফে নিতে কোনো রকম পিছপা হননি। মুস্তাহাব হলো বেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং গনিমত হিসেবে এই ফজিলতপূর্ণ সময়, মাসকে গ্রহণ করা।

◈ রমাযানের শেষে সালাফদের অবস্থা -

রমাযানের শেষে সালাফদের বিষন্ন, বিবর্ণ চেহারা হত। ভারাক্রান্ত মনে তাঁরা রমাযানের প্রাপ্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দীর্ঘ সাধনা কবুল করেন।

বাশার আল-হাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে- এমন ক্বওম আছে যারা রমাযানে ইবাদতগুজার ও আমলের অনেক পরিশ্রম করে। অতঃপর রমাযান শেষ হলে তা পরিত্যাগ করে। তিনি একথা শুনে বলেন - ঐ ক্বওম কত ই না নিকৃষ্ট যারা রমাযান ছাড়া আল্লাহকে চেনে না।[১৪৬]

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন, অতঃপর তিনি খুতবায় বলেন, হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর জন্য ৩০ দিন সিয়াম রেখেছো, ৩০ দিন ক্বিয়াম করেছো। আর আজকে তোমরা বের হয়েছো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করার জন্য যেন আল্লাহ তোমাদের থেকে রমাযানের সিয়াম ও ক্বিয়াম কবুল করেন।[১৪৭]

প্রখ্যাত তাবেয়ী ক্বাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- যাকে রমাযান মাসে ক্ষমা করা হয়নি তাকে রমাযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে ক্ষমা করা হবে না।[১৪৮]

পরিশেষে বলতে চাই সালাফরা আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাদের চলার পথকে শাণিত করে । ইবাদতগুজার, পরহেজগারিতা ও দুনিয়া বিমুখ জীবন আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে শেখায়। ইবাদত এভাবেই করতে হয় যার ফলাফল উভয় জাহানের প্রভূত কল্যাণের মালিক হওয়া যায়। আল্লাহ আমাদের সালফে সালেহীনগণের পথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুক আমিন। ◻◻

---

[১৪৪] *হিলআতুল আওলিয়া*
[১৪৫] *ইসলাম ওয়েব থেকে গৃহীত*
[১৪৬] *মিফতাহুল আফকার লিলত্বায়াহুব লিদারিল ফেরার ,২য়পৃষ্ঠা - ২৮৩*
[১৪৭] *লা'ত্বায়িফুল মা'আরেফ ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ পৃষ্ঠা-২০৯*
[১৪৮] *লা'ত্বায়িফুল মা'আরেফ ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ পৃষ্ঠা - ২১১*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) ঃ ই'তেকাফ কাকে বলে? ই'তেকাফ করা কি সুন্নাত? ই'তেকাফ করার জন্য জামে মসজিদ হওয়া শর্ত? দয়া করে জানাবেন।

মিজানুর রহমান, চারঘাট, রাজশাহী

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার জন্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করার নাম ই'তেকাফ। লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্য ই'তেকাফ করা সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"মসজিদে ই'তেকাফ করা অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।"[১] সহীহ্ বুখারীতে প্রমাণিত আছে, নবী ﷺ ই'তেকাফ করেছেন, তাঁর সাথে সাহাবীগণও ই'তেকাফ করেছেন।[২] ই'তেকাফ করা শরীয়তসম্মত। এটা রহিত হয়ে যায়নি। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "নবী ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রমাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীরা ই'তেকাফ করেছেন।"[৩]

সহীহ্ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমাযানের প্রথম দশকে ই'তেকাফ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় দশকে ই'তেকাফ করেছেন। অতঃপর বলেন,

إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ.

"লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্য আমি রমাযানের প্রথম দশকে ই'তেকাফ করেছি। তারপর দ্বিতীয় দশকে ই'তেকাফ করেছি। অতঃপর অহীর মাধ্যমে আমাকে বলা হয়েছে, নিশ্চয় উহা শেষ দশকে। তোমাদের কেউ যদি ই'তেকাফ করতে চায়, সে যেন ই'তেকাফ করে।"[৪] অতঃপর লোকেরা তাঁর সাথে ই'তেকাফ করেছে। ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ই'তেকাফ করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ আমার জানা নেই।' তাই কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইজমার দলীলের ভিত্তিতে ই'তেকাফ করা সুন্নাত।

শহরের যেসব মসজিদে জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলো ই'তেকাফ করার স্থান। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ "মসজিদসমূহে ই'তেকাফ করা অবস্থায় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।" উত্তম হচ্ছে জুম'আর মসজিদে ই'তেকাফ করা। যাতে করে জুম'আ আদায় করার জন্য বের হতে না হয়। অন্য মসজিদে ই'তেকাফ করলেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে জুম'আর জন্য আগেভাগে মসজিদে চলে যাবে।

প্রশ্ন (২) ঃ ই'তেকাফের সুন্নাতগুলো কী কী? নবী ﷺ থেকে ই'তেকাফের সুন্নাতী পদ্ধতি কী?

ইয়ার আলী, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর ঃ ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে বেশি নফল-তাহাজ্জুদ নামায আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার এবং অন্যান্য সৎকাজে মশগুল থাকা। কেননা এটিই ই'তেকাফের উদ্দেশ্য। তবে মানুষের সাথে সামান্য কথা বলায় কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষ করে যখন কথা উপকারী হয়।

ই'তেকাফের সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে রমাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করা। ﷺ বলেন,

مَن كانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ.

'যে ব্যক্তি আমার সাথে ই'তেকাফ করতে চায়, সে যেন রমাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করে"।[৫] আর যে ব্যক্তি

[১] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭*
[২] *সহীহ বুখারী, অধ্যায় : ইতেকাফ*
[৩] *সহীহ বুখারী, অধ্যায় : ইতেকাফ*
[৪] *সহীহ বুখারী, অধ্যায় : ইতেকাফ*
[৫] *সহীহ বুখারী হা : ২০২৭*

এই দিনগুলো ই'তেকাফ করতে চায়, তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, রমাযানের ২১তম রাতের সূর্য অস্তের আগেই মসজিদে প্রবেশ করা। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। এটাই সহীহ মারফু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। অনুরূপভাবে সে ঈদের রাতও মসজিদে অবস্থান করবে। অতঃপর মসজিদ থেকেই ঈদগাহে যাবে। যাতে শেষ দশটি রাতের সবগুলো রাতের ফযীলতই অর্জন করতে পারে।

☞ *প্রশ্ন (৩) ঃ* ই'তেকাফকারীর জন্য প্রয়োজন পূরণ করা, পানাহার করা এবং চিকিৎসার জন্য বের হওয়া কি জায়েয?

শহীদুল ইসলামস, আত্রাই, নওগাঁ

উত্তর ঃ মসজিদ থেকে ই'তেকাফকারীর বের হওয়াকে আলেমগণ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। **(১) জায়েয :** শরীয়ত অনুমোদিত ও অভ্যাসগত জরুরি কাজে ই'তেকাফের স্থান থেকে বের হওয়া জায়েয। যেমন জুম'আর নামাযের জন্য বের হওয়া, পানাহার নিয়ে আসার কোনো লোক না থাকলে পানাহার করার জন্য বের হওয়া, ফরয অযু ও ফরয গোসল করার জন্য বের হওয়া এবং পেশাব-পায়খানা করার জন্য বের হওয়া। **(২) আনুগত্যের কাজে বের হওয়া :** এমন আনুগত্যের কাজে বের হওয়া, যা ওয়াজিব নয়। যেমন রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া। তবে ই'তেকাফ শুরু করার সময় এসব কাজের জন্য বের হওয়ার যদি শর্ত করে নেয়, তবে জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয নয়। **(৩) ই'তেকাফবিরোধী কাজে বের হওয়া :** এমন কাজে বের হওয়া, যা ই'তেকাফের নিয়ম-নীতি বিরোধী। যেমন বাড়ী যাওয়া, কেনা-বেচার জন্য বের হওয়া, স্ত্রী সহবাস করার জন্য বের হওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজে বের হওয়া। এসব কাজে কোনোভাবেই ই'তেকাফকারীর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। তবে ই'তেকাফ শুরু করার সময় শর্ত করে নিলে বের হওয়া জায়েয। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

☞ *প্রশ্ন (৪) ঃ* লাইলাতুল কদরের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।

আছিয়া সুলতানা, ঢাকা।

উত্তর ঃ রমাযান মাসে নবী ﷺ-এর হেদায়াত হল সালাত কায়েম করা, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দান-খয়রাতসহ অন্যান্য কল্যাণকর কাজের দিকে বেশি বেশি অগ্রসর হওয়া। প্রথম বিশ দিনে তিনি ঘুমাতেন এবং নামায পড়তেন। শেষ দশকে তিনি পরিবার-পরিজনকে জাগাতেন, ইবাদতের জন্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন এবং সারা রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি রমাযান মাসে এবং লাইলাতুল কদরে কিয়াম করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন :

﴿مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ﴾»

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছাওয়াবের আশায় রমাযানে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৬] সেই সঙ্গে লাইলাতুল কদরের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। এটি হচ্ছে সূরাতুল কদর। এতে বলা হয়েছে যে, লাইলাতুল কদরের 'ইবাদত করার ছাওয়াব আল্লাহর কাছে এক হাজার মাস তথা লাইলাতুল কদরবিহীন তিরাশি বছরের ইবাদতের ছাওয়াবের চেয়েও বেশি।[৭]

☞ *প্রশ্ন (৫) ঃ* নির্দিষ্ট করে ২৭ রমাযান লাইলাতুল কদর উদযাপন করার হুকুম কী?

শামসুল আলম টাইগারপাস, চট্টগ্রাম

উত্তর : নবী ﷺ বলেছেন : লাইলাতুল কদর রমাযান মাসের শেষ দশ দিনে এবং সেটি শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহের যে কোনো একটি রাতে। তিনি বলেন : তোমরা তা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে তালাশ কর।[৮]

সহীহ বুখারীতে আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ،

[৬] *সহীহ বুখারী হা : ৩৭, সহীহ মুসলিম হা : ১৭৩*
[৭] *বিস্তারিত দেখুন, সূরা কদরের ব্যাখ্যা, তাফসীর ইবনে কাসীর*
[৮] *তিরমিযী হা : ৭৯২*

وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ،التَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ»

"মহানবী ﷺ লাইলাতুল কদরের তারিখ নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। অতঃপর দুইজন মুসলিম এটা নিয়ে বিতর্ক শুরু করলো। নবী ﷺ তখন বললেন, আমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক লোক এটা নিয়ে বিতর্ক করার কারণে সেটা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি আশা করি এতে তোমাদের ভালোই হবে। তোমরা এটা ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে তালাশ করো।[৯] অন্যান্য সহীহ মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ রমাযানের শেষ দশ রাতের বেজোর রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার আদেশ দিয়েছেন। সবগুলো বর্ণনা একসাথে মিলিয়ে যেটা সাব্যস্ত হচ্ছে, তা হলো রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতেই লাইলাতুল কদর রয়েছে।

সুতরাং ২৭ তারিখের রাতকে নির্দিষ্ট করে তাকেই লাইলাতুল কদর মনে করা এবং মাত্র সেই রাতেই লাইলাতুল কদর উদযাপন করা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের বিরোধী। কেননা নবী ﷺ নির্দিষ্টভাবে কোনো রাতে লাইলাতুল কদর উদযাপন করেননি। তাই নির্দিষ্ট করে উহা পালন করা বিদ'আত।

☞ *প্রশ্ন (৬) :* ফিতরা কাকে বলে? ফিতরার পরিমাণ কত? তা কখন আদায় করতে হবে? সহীহ হাদীস মোতাবেক জবাব দিবেন বলে আশা করি।

আ : রহিম- লোহাগাড়া, নড়াইল

উত্তর ঃ রমাযান মাস শেষে সিয়াম পালনকারীকে বাজে অনর্থক কথা ও কাজের অপরাধ থেকে এবং ঈদের দিন ফকীর-মিসকীনদের ওপর সহজ করার জন্য যা দান করা হয়, তাই ফিতরা। ফিতরার পরিমাণ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ

রাসূল ﷺ প্রত্যেক স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় মুসলমানের ওপর যাকাতুল ফিতর এক 'সা' পরিমাণ খেজুর বা যব ফরয করেছেন। তিনি লোকদের ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।[১০]

ফিতরা বের করার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন নামাযের পূর্বে। কিন্তু ঈদের একদিন বা দুই দিন আগে তা আদায় করা জায়েয। কেননা এতে প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের জন্যই সহজতা রয়েছে। কিন্তু এরও আগে বের করার ব্যাপারে আলেমদের প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তা জায়েয নয়। এই ভিত্তিতে ফিতরা আদায় করার সময় দু'টি: ১) জায়েয বা বৈধ সময়। তা হচ্ছে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে। ২) ফযীলতপূর্ণ সময়। তা হচ্ছে ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে। কিন্তু নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা হারাম। এভাবে বিলম্ব করে আদায় করলে ফিতরা হিসেবে আদায় হবে না। ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেন,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

'নামাযের পূর্বে যে ফিতরা আদায় করবে তা কবুলযোগ্য যাকাত বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর আদায় করবে তার জন্য উহা একটি সাধারণ সাদাকা বা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে।'[১১]

☞ *প্রশ্ন (৭) ঃ* টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় সম্পর্কিত হাসান বাছরীর বর্ণনাটি[১২] সহীহ কিনা বিস্তারিত জানতে চাই। সহীহ হলে আমল করা যাবে কি?

মোঃ রোকনুযযামান, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, মানুষের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। কেননা সহীহ্ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

[৯] *সহীহ বুখারী হা : ৪৯*

[১০] *মুখতাসার সহীহ বুখারী, হা : ৭৫৪*

[১১] *আবু দাউদ, অধ্যায়: যাকাত হা : ১৩৭১*

[১২] *মুছান্নাফ আবী শায়বাহ হা : ১০৩৭০*

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য ফিতরা হিসেবে বের করতাম। খেজুর, যব, কিসমিস ও পনির।"[১৩] এ হাদীসে গমের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া যাকাতুল ফিতরে গম দেয়া যাবে এরকম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোনো হাদীস আমার জানা নেই। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারপরও নিঃসন্দেহে গম দ্বারা ফিতরা আদায় বৈধ।

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

"রোযাদারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের জন্য খাদ্যস্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।"[১৪]

টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় সম্পর্কিত হাসান বাছরীর বর্ণনাটি মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বায় এসেছে। এতে উল্লেখ আছে যে, উমার ইবনু আব্দুল আযীয অর্ধ সা এর মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করার রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করেছিলেন। এটা সহীহ হলেও রাসূল ﷺ থেকে সহীহ মারফু হিসেবে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে তা আমলযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে যখন বলা হলো যে, লোকেরা তো বলছে যে, উমার উবনু আব্দুল আযীয টাকা দিয়ে ফিতরা চালু করেছেন, তখন তিনি বলেছেন, তারা রাসূল ﷺ-এর কথা বাদ দিচ্ছে এবং বলছে অমুক এটা বলেছে অমুক এটা বলেছে। মোটকথা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের মোকাবিলায় হাসান বসরী কিংবা উমার ইবনু আব্দিল আযীয বা অন্য কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৮) ঃ সাহারী খাওয়ানোর জন্য ডাকাডাকি করা কি বৈধ?

আকমাল হোসেন, কালাই, জয়পুরহাট

উত্তর ঃ দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি বের করার বদলে সুন্নাতের অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। মুসলিমগণ যতদিন সুন্নাতের উপর কায়েম ছিল, ততদিন বরকত ও কল্যাণের মধ্যেই ছিল। রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত থেকে যখন মানুষ দূরে সরে গেছে, তখনই ফিতনা, বিভ্রান্তি ও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিমদের সোনালী যুগ পার হওয়ার পর সুন্নাত পরিহার করে লোকেরা যেসব নতুন নতুন তরীকা বের করেছে, তার মধ্যে পবিত্র রমাযান মাসে আযানের মাধ্যমে সাহারীর সময় জানিয়ে দেয়ার বদলে নানা ধরণের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা। সাহারীর সময় সম্পর্কে অবগত করার ক্ষেত্রে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীদের সুন্নাত হচ্ছে কিছু শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে আযানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু পরবর্তী যুগসমূহে এই সুন্নাত সম্মত পদ্ধতি বাদ দিয়ে নানা তরীকা বের করা হয়েছে। রমাযান মাসে মানুষকে সাহারী খাওয়ানোর জন্য লোকেরা যেসব পদ্ধতি বের করেছে, তার মধ্যে রয়েছে পাড়ায়-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে এই কথা বলা যে, উঠুন. সাহারী খান ইত্যাদি। কোনো কোনো এলাকায় অর্ধেক রাত পার হওয়ার পর সঙ্গীত গাওয়া ও ঢোল বাজানোর প্রথাও লক্ষ্য করা গেছে।

মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম ইবনুল হাজ আল-মালেকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুআযযিনগণ আযান দেয়ার বদলে রমাযান মাসে অর্ধেক রাত পার হলে মানুষকে সাহারী খাওয়ানোর যেসব পদ্ধতি বের করেছে, তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করতে হবে। কেননা নবী ﷺ-এর যুগে এসব ছিল না। তিনি এগুলোর আদেশ দেননি। পূর্বযুগের নেককার লোকদের অভ্যাসও এটা ছিল না। সুতরাং সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ।[১৫] তিনি আরো বলেন, সাহারী খাওয়ানোর জন্য আযান ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে আহবানের কোনো ভিত্তি নেই। অর্থাৎ এর জন্য ডাক-ঢোল পেটানো ভিত্তিহীন।

তিনি আরো বলেন, মিসরী ও ইয়ামানীরা সর্বপ্রথম বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে লোকদেরকে সাহারী খাওয়ানোর প্রথা বের করেছে। সিরিয়াবাসীরা সর্বপ্রথম গান গাওয়া ও ঢোল বাজানোর প্রথা চালু করেছে।

মরক্কোর লোকেরা সিরিয়াবাসীদের মতোই করতো। সাহারী খাওয়ার সময় হলে তারা সিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ করতো। তারা সাতবার অথবা পাঁচবার সিঙ্গায় ফুঁ দিতো। ফুঁ দেয়া শেষ হলেই তাদের খাওয়া-দাওয়া হারাম হয়ে যেতো।[১৬]

আর বাংলাদেশি মুসলিমগণ সম্ভবত ডাকাডাকির পদ্ধতিটাই গ্রহণ করেছে। কোনো কোনো অঞ্চলে মসজিদে ইসলামী

[১৩] *বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: ফিতরা হচ্ছে এক ছা' পরিমাণ খাদ্য*
[১৪] *আবু দাউদ, অধ্যায়: যাকাত*
[১৫] *আল-মাদখাল- ২/২৫৩*
[১৬] *উপরোক্ত তথ্যসূত্র*

সঙ্গীত চালু করার প্রথা লক্ষ্যণীয়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে একসময় ডাকাডাকির নিয়মও ছিল।

নিঃসন্দেহে উপরোক্ত কাজগুলো বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলো বর্জন করে সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ.

তোমাদের কাউকে যেন বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু'-এর আযান সাহুর খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কারণ তিনি রাত অবশিষ্ট থাকতেই আযান দেন। যাতে তাহাজ্জুদ নামাযরত ব্যক্তি অবসর নেয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করেন।[১৭]

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিতেন এই কথা বুঝানোর জন্য যে, ফজরের সময় হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই তিনি রাতে তাহাজ্জুদরত ব্যক্তিকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় ফিরিয়ে দিতেন। যাতে করে সামান্য ঘুমিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে ফজরের সালাতের জন্য জাগতে পারেন অথবা বিতর না পড়ে থাকলে বিতর পড়ে নিতে পারেন অথবা সিয়াম রাখার ইচ্ছা পোষণকারী যেন সাহারী খেয়ে নিতে পারেন অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তি যেন তাহাজ্জুদ কিংবা সাহারী খাওয়ার জন্য জাগতে পারেন।

অতএব এই বিরাট ইবাদতের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। তাই আমাদের উচিত অনর্থক কাজ ও খেল-তামাশা বাদ দিয়ে সুন্নাতের দিকে ফিরে আসা। এতেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

প্রশ্ন (৯) : ঈদের নামাযে মিম্বার নিয়ে যাওয়ার হুকুম কী?

-আবুল হাশেম- রূপসা, খুলনা

উত্তর : নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদগাহে কোনো মিম্বার ছিল না। মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের যে হাদীসে বলা হয়েছে অতঃপর তিনি নামলেন এবং মহিলাদের কাছে গেলেন সেই হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে সম্ভবত : তিনি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যা থেকে তিনি নেমেছেন।

মদীনার ঈদগাহে উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকামই সর্বপ্রথম মিম্বার স্থাপন করেন। লোকেরা তার এ কাজের প্রতিবাদ করেছে। আর কাছীর ইবনুস সালতই সর্বপ্রথম মারওয়ানের শাসনামলে পাকা মিম্বার তৈরি করেন। অতএব ঈদের সালাতের জন্য স্থায়ীভাবে মিম্বার বানিয়ে রাখা অথবা জামে মসজিদ থেকে জুম'আর খুতবার মিম্বার নিয়ে যাওয়া সুন্নাতের পরিপন্থি।

***প্রশ্ন (১০) ঃ* ঈদের সালাতের কিছু আদব ও আহকাম জানতে চাই। দয়া করে জানাবেন**

মো : রুবেল কাজী, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর ঃ ইমাম ইবুনল কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জগৎ বিখ্যাত কিতাব যাদুল মা'আদে বলেন, ঈদের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খেয়ে বের হতেন। আর ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ থেকে ফেরত আসার আগে কিছুই খেতেন না। ফেরত এসে তিনি কোরবানীর গোশত খেতেন। তিনি দুই ঈদের দিন গোসল করতেন। এ বিষয়ে দু'টি যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তা ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ়তার সাথে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে চলতেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন। মদীনার ঈদগাহে কোনো কিছুই (বর্তমান সময়ের ন্যায় মিম্বার) নির্মাণ করা হয়নি।

তিনি ঈদুল ফিতরের নামায বিলম্বে আদায় করতেন এবং ঈদুল আযহায় তা করতেন না। ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী হওয়া সত্ত্বেও সূর্য পুরোপুরি উদিত হওয়ার পূর্বে ঈদের মুসাল্লার উদ্দেশ্যে বের হতেন না। ঘর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।

ঈদগাহে পৌঁছে তিনি আযান, ইকামত ও নামাযের জন্য ডাকাডাকি ছাড়াই নামায শুরু করে দিতেন। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ ঈদের মাঠে গিয়ে নামাযের পূর্বে বা পরে কোনো সুন্নাত বা নফল নামায পড়তেন না।

তিনি খুতবার পূর্বে নামায পড়তেন। দুই রাক'আত ঈদের নামায পড়তেন। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট সাতটি তাকবীর পাঠ করতেন। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে সামান্য বিরতি গ্রহণ করতেন। তাকবীরগুলোর

[১৭] *সহীহ বুখারী হা: ৬২১, সহীহ মুসলিম হা : ১০৯৩*

মাঝখানে তাঁর থেকে নির্দিষ্ট কোনো দুআ বা যিকির বর্ণিত হয়নি। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক তাকবীর পাঠ করার সময় রাফউল ইয়াদাঈন করতেন।

তাকবীর পাঠ শেষ করে তিনি কিরাআত শুরু করতেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা অতঃপর সূরা কাফ পাঠ করতেন আর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইকতারাবাত তথা কামার পাঠ করতেন। কখনও কখনও তিনি সূরা আ'লা ও গাশীয়া দিয়েও ঈদাঈনের নামায পড়েছেন। উপরোক্ত চারটি সূরা ব্যতীত অন্য কোনো সূরা দিয়ে দুই ঈদের নামায পড়ার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই।

কিরাআত পাঠ শেষে তিনি আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যেতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে পরপর পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর পাঠ করতেন। তাকবীর পাঠ শেষে কিরাআত শুরু করতেন।

☞ *প্রশ্ন (১১)* ঃ শাওয়ালের ৬ সিয়াম কখন থেকে শুরু করতে হবে?

নাম : হাসান রেজা, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

"যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখলো অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলো, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখলো।"[১৮] এই সিয়াম ঈদের দিনের পরের দিন থেকে শুরু করবে। একাধারে ৬টি সিয়াম সম্পন্ন করা উত্তম। তবে ভেঙে ভেঙে সুবিধা মোতাবেক করলেও চলবে।

☞ *প্রশ্ন (১২)* ঃ এক লোক রমাযান মাসের কয়েকটি সিয়াম রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তার পক্ষ থেকে কি রোযাগুলো কাযা আদায় করতে হবে?

ছলেমান মুন্সি, আদমদীঘি, বগুড়া।

উত্তর : এ ব্যক্তির পক্ষ হতে বাকী সিয়ামগুলো আদায় করতে হবে না এবং এর বদলে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াতেও হবে না। কারণ, মৃত্যুবরণ করার কারণে তার ওপর থেকে শরীয়তের বিধিবিধান রহিত হয়ে গেছে।

☞ *প্রশ্ন (১৩)* : রমাযান মাসে কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে যদি সিয়াম রাখতে না পারে, তাহলে সে কী করবে?

উত্তর : কেউ যদি রমাযান মাসে হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষ হতে রোযা কাযা করতে হবে না এবং মিসকীনকে তার বদলে খাবারও দিবে না; বরং সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে। সুস্থ হয়ে সে রমাযান মাস চলে যাওয়ার পর সিয়ামগুলো কাযা করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।"[১৯] অতএব অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হচ্ছে, সুস্থ হলেই কাযা রোযাগুলো আদায় করে নেয়া।

☞ *প্রশ্ন (১৪)* ঃ যার ওপর রমাযানের কাযা সিয়াম বাকী আছে, সে আগে শাওয়ালের ৬ সিয়াম রাখবে নাকি আগে রমাযানের কাযা রোযা পূর্ণ করবে?

মুরতাজা হোসাইন, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা

উত্তর ঃ যার যিম্মায় রমাযানের কাযা রয়ে গেছে, তার জন্য নফল রোযা রাখা জায়েয আছে কি না, আলেমগণ এই মাসআলায় মতভেদ করেছেন। আল্লামা বিন বায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে নারী-পুরুষের ওপর রমাযানের কাযা সিয়াম বাকী আছে, সে আগে রমাযানের কাযা সিয়াম পূর্ণ করবে। অতঃপর সময় অবশিষ্ট থাকলে শাওয়ালের সিয়াম পালন করবে। কারণ কারো ওপর ওয়াজিব সিয়াম অবশিষ্ট থাকলে ওয়াজিব পালন না করে নফল সিয়াম শুরু করা ঠিক নয়। ওয়াজিব যিম্মায় নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে তার শাস্তি হতে পারে। আর নফল পালন না করলে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

ফযীলাতুশ শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যার ওপর রমাযানের রোযা কাযা রয়েছে সে যদি তা কাযা আদায় না করেই শাওয়ালের ছয় রোযা রাখে, তাহলে তার জন্য শাওয়ালের ছয় রোযার ছাওয়াব সাব্যস্ত হবে না।

[১৮] *সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সিয়াম*

[১৯] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫*

☞ প্রশ্ন (১৫) ঃ যে ব্যক্তি নামায শেষ করার পর জানতে পারলো যে, সে এমন অপবিত্র অবস্থায় ছিল, যাতে গোসল আবশ্যক তার করণীয় কী?

মো: আব্দুল্লাহ মণ্ডল, রংপুর সদর, শালবন মিস্ত্রিপাড়া

উত্তর ঃ যে লোক নামায আদায় করার পর জানতে পারবে যে, তার সাথে বড় নাপাকী বা ছোট নাপাকী ছিল তার ওপর ওয়াজিব হলো, সে অযু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে উক্ত নামায পুনরায় আদায় করা। কেননা নবী ﷺ বলেছেন,

لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.

"পবিত্রতা ব্যতীত কারো নামায কবূল করা হবে না"।[২০]

☞ প্রশ্ন (১৬) ঃ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো যদি অহঙ্কারবশত না হয়, তাহলেও কি শাস্তি হবে? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস দ্বারা যারা দলীল পেশ করে তাদের জবাব কিভাবে দেয়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ কেউ যদি লুঙ্গি, পায়জামা প্যান্ট ইত্যাদি কাপড় অহঙ্কারবশত টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে তাহলে তার শাস্তি হলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

আর যদি অহঙ্কারের উদ্দেশ্যে না ঝুলায়, তাহলে টাখনুর নীচে যেই পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে, সেই পরিমাণ জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। নবী করীম ﷺ বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْم: المُسْبِلُ وَالمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ.

"তিন লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (১) টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, (২) দান করে খোঁটাদানকারী এবং (৩) মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী বিক্রিকারী"।[২১] তিনি আরো বলেন,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত তার কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না"। এই ধমক ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অহঙ্কারবশত তার কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে।

আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার ব্যতীত এমনিতেই কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে তার ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

مَا أَسْفَلَ الكعبين مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"লুঙ্গির যেই পরিমাণ টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে, সেই পরিমাণ জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে"।[২২] এখানে অহঙ্কারের কথা উল্লেখ নেই। তাই পূর্বোক্ত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অহঙ্কারের শর্তারোপ করা ঠিক নয়। কেননা আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ومَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"মুমিন ব্যক্তির লুঙ্গি থাকবে নিসফে সাক পর্যন্ত। তবে নিসফে সাক থেকে টাখনুর ওপর পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু টাখনুর নিচে যে পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে, সে পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না"।[২৩]

মোটকথা অহঙ্কারবশত হোক অথবা অহঙ্কারবশত না হোক সর্বাবস্থায় টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা নিষেধ।

---

[২০] *সহীহ্ মুসলিম: কিতাবুত্ তাহারাহ*

[২১] *মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান*

[২২] *সহীহ্ বুখারী: কিতাবুল লিবাস*

[২৩] *আহমাদ: (৩/৫), আবু দাঊদ: কিতাবুল লিবাস, মালেক: (২/২১৭), ইবনে মাজাহ: কিতাবুল লিবাস, নাসাঈ: কিতাবুয্ যীনাত, তারগীব ওয়াত্ তারহীব: (৩/৮৮)*